অলৌকিক

বিমল কর

অলৌকিক / বিমল কর

অবিশ্বাস্য, তবু অবাস্তব বলা যাবে না—এমনই এক ঘটনাবহুল পটভূমিতে বিমল কর-এর এই নতুন রোমাঞ্চকর উপন্যাস। আমরা অনেকেই পড়েছি বিদেশী সেই অদ্ভূত ক্ষমতাবান লোকটির কথা, যে কিনা শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে বেঁকিয়ে দিতে পারে কাঁটা, চামচ কিংবা ছুরি। মানুষের এই ধরনের নানান অস্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছেন যে-ভদ্রলোক তিনি নিজেও যেন কিছুটা অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী। নইলে সিনেমার সিটে তাঁকে দেখে মৃত বলে ভুল হবে কেন বরদার? অথচ সিনেমা ভাঙার পর সেই লোকটিকেই আবার জলজ্যান্ত অবস্থায় চোখের সামনে দেখে বরদা অবাক। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ভদ্র, মার্জিত, বুদ্ধিমান মানুষ। ভেল্‌কিঅলা বা ভড়ংবাজ নন। দুমকার কাছে একটা রিসার্চ সেন্টার খুলেছেন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

আলাপ হবার পর বরদাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। নানা ধরনের অবিশ্বাস্য শক্তিধর মানুষ সেই গবেষণাকেন্দ্রে, এ-ছাড়াও রয়েছে এমন একজন, যাকে হুবহু বরদার মতোই দেখতে। এই বিচিত্র পরিবেশে বরদা শেষ পর্যন্ত রক্ত-হিম-করা যে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল, তাই নিয়েই এই দুরন্ত স্বাদের উপন্যাসটি লিখেছেন বিমল কর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র উৎকণ্ঠা-উত্তেজনায় ভরা।

81-7066-788-7

১৫·০০

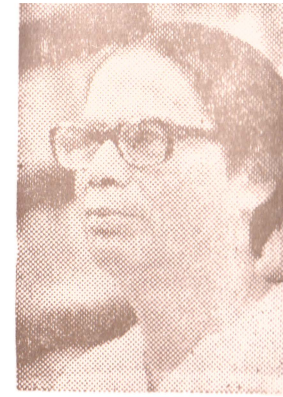

জন্ম : ৩ আশ্বিন ১৩২৮। ইংরাজী ১৯২১।
শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। জব্বলপুর, হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।
কর্মজীবন : ১৯৪২ সালে এ. আর. পি-তে ও ১৯৪৩-এ আসানসোল মিউনিশান প্রোডাকশন ডিপোয়। ১৯৪৪-এ রেলওয়ের চাকরি নিয়ে কাশী।
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরাগ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, পরে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা ও 'সত্যযুগ'-এর সাব-এডিটর। এ সবই ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে।
১৯৫৪—১৯৮২ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : ক্লিওপ্যাট্রা ও তুমি।
বহু পুরস্কার পেয়েছেন।
আনন্দ পুরস্কার : ১৯৬৭।
আকাদমি পুরস্কার : ১৯৭৪।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার : ১৯৮১।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার : ১৯৮২।
'ছোটগল্প—নতুন রীতি' আন্দোলনের প্রবক্তা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অলৌকিক

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১—তৃতীয় মুদ্রণ মে ১৯৮৫
মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০
চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯০ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7066-788-7

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য ১৫·০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

ওয়ান্ডার মামা
কাপালিকরা এখনও আছে
কালবৈশাখীর রাত্রে
কিশোর ফিরে এসেছিল
জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু
পাখিঘর
ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন
রাজবাড়ির ছোরা ও
হারানো জীপের রহস্য
শুদ্ধানন্দ প্রেত সিদ্ধ ও
কিকিরা
হারানো ডায়েরির খোঁজে

সিনেমা দেখতে গিয়ে বরদা এ-রকম এক ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি। বরং যখন নিউ মার্কেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মেজাজ খুব হালকা। যতরকম বোঝা মাথার ওপর চাপানো ছিল সব নামানো হয়ে গেছে, পরীক্ষা খতম, এ-জন্মের মতন বই মুখস্থ করার পালা শেষ। এ যন্ত্রণা আগেও শেষ হতে পারত, কিন্তু আজকাল যা হয়—গড়িয়ে-গড়িয়ে, এ বছরের পরীক্ষা আসছে বছরেও হবে কি হবে না করতে-করতে পাক্কা দেড় বছর দেরি হয়ে গেল। তবু শেষমেশ যে হয়েছে, আর বরদা তার লঁ ফাইন্যাল দিতে পারল, এতেই সে খুশী।

মেজাজটা হালকা, বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগছিল বলে বরদা নবাবী চালে দুটো দামী টিকিট কিনে ফেলল। মানিকের আসার কথা। মানিক আগেই বলে দিয়েছিল, "তুই গিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলবি, আমি পৌনে ছ'টা নাগাদ হাজির হব।"

মানিক বরদার বন্ধু; দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তাও রয়েছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে কাজ করে। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা, দেখলে মনে হয় না-জানি কত বয়েস, পুলিস-টুলিসে চাকরি করে নিশ্চয়, লালবাজারের কোনো সার্জেন্ট। আসলে ওসব কিছুই নয়, মানিকের চেহারার গড়নটাই যা দৈত্যদৈত্য, স্বভাবে একেবারে ছেলেমানুষ, নরম মন, পকেটমারকেও দু-চারটে চড়চাপড় লাগাতে পারে না।

মানিকই বলে দিয়েছিল "দি ফিয়ার বলে একটা ছবি হচ্ছে। টিকিট কাটবি। ভুতুড়ে ছবি। টেরিফিক ছবি।"

বরদা ভেবেছিল, টিকিট-ফিকিট পাবে না। একেবারে ভুল ধারণা। ভিড় তেমন কিছু নয়। অজস্র টিকিট রয়েছে। তিন হপ্তার মাথায় কত আর ভিড় হতে পারে। হাজার হোক ভূতের ছবি তো!

মানিকের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে বরদা একবার ওজন নিল ওয়েয়িং-মেশিনে। না, ওজন কমেনি। একটা সিগারেট খেল। পোস্টার আর ছবি দেখল সিনেমার। সে ভেবেছিল এডগার অ্যালান পোয়ের কোনো গল্প-টল্পর ছবি। তা নয়। অ্যালান পোয়ের গল্প নিয়ে ছবি আগে দেখেছে বরদা। সেই যে একটা ছবিতে কাটা-মুণ্ডু নিয়ে লোফালুফি খেলার দৃশ্য—বিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন যাই হোক—সেই দৃশ্যের কথা এখনও মনে আছে বরদার। রীতিমত ভয় হয় দেখলে।

না, মানিকটা এখনও আসছে না। ছ'টা বেজে গেছে!

বরদা আবার একবার বাইরে এল, রাস্তার কাছে এসে দেখল, মানিকের কোনো পাত্তা নেই। রাস্তায় গিজগিজে ভিড়, হরদম গাড়ি ঢুকছে, নিউ মার্কেটের খদ্দের সব। লাইট হাউসের দিকে এখনও হল্লা, মারপিটের ছবি চলছে।

বরদা ঘাড় দেখল নিজের। ছ'টা বারো। কতক্ষণ আর এভাবে অপেক্ষা করা যায়! হল কী মানিকের? অফিসে আটকে গেছে? ওর তো টহল মারার চাকরি। কোথাও গিয়ে ফেঁসে গেছে? আজকাল কলকাতার গাড়িঘোড়ার যা হাল, কোথায় কোন্ জ্যামে আটকে গেছে বলা মুশকিল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যায়। এখন বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেখাবে; তারপর ফিল্মস ডিভিশনের ছবি। মনে মনে বিরক্ত এবং অধৈর্যই হয়ে পড়ছিল বরদা। মানিকের হল কী? কোনো ঝামেলায় পড়েনি তো? আপদ-বিপদ?

শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা গেল না।

বরদা কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। সসঙ্কোচে বলল, "আমার যদি একটা উপকার করেন?"

কাউন্টারের ওপার থেকে পাকাচুল ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

বরদা বলল, "আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। তার টিকিট কেটেছি। এখনও সে এসে পৌঁছয়নি। আমি তার টিকিটটা আপনার কাছে রেখে যাই। যদি সে আসে, তাকে যদি দয়া করে দিয়ে দেন।"

ভদ্রলোক রাজী হচ্ছিলেন না। নিয়ম নেই। বরদা আবার একটু অনুরোধ করল। বিনয় করেই বলল, "প্লিজ টিকিটটা রেখে দিন।"

রাজী হলেন ভদ্রলোক। বরদা বলল, "আমার বন্ধুর নাম মানিক। আপনাদের কাউন্টার ক্লোজ হবার আগে যদি না আসে—টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।" বলে বরদা ছুটল সিঁড়ি ভাঙতে, লিফ্ট নিল না।

ইন্টারভ্যাল চলছিল। আবার ঘর অন্ধকার হল। গোটা দশেক স্লাইড। পরের ছবির ট্রেলার। তারপর ছবি শুরু হল।

প্রথম থেকেই আঁতকে উঠতে হয়। টাইটেলের মধ্যেই তিন-চারটে মৃত্যু, সবই দুর্ঘটনার মতন, স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে বেড়াতে, হঠাৎ গাড়ি উলটে আগুন ধরে গেল; বিশাল বাড়ির ছাদের কার্নিশে উঠে কাজ করছে একটা লোক, কোমরে প্রোটেকশান বেল্ট, হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস এসে লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কে একজন জলে সাঁতার কাটছিল—আচমকা তার পা ধরে জলের তলায় কে যেন টেনে নিয়ে যেতে লাগল। জলে ডুবে মরল লোকটা। শেষে দেখা গেল, কোথায় যেন এক প্রাসাদতুল্য বাড়ির বাগান, বাগানের মধ্যে মস্ত কাচের ঘর, নানা ধরনের উদ্ভিদ, লতাপাতা, ফুল। কাচের ঘরে বসে একটি মেয়ে ছবি আঁকছে, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই; মাথার ওপরকার

কাচের চাল ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। তারপর দেখা গেল, কেমন কিম্ভূত এক ছায়া যেন মাঠঘাট রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ন্ত ধুলোর ঝাপটার মতন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

বরদা রীতিমত ডুবে গিয়েছিল ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে। রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করেছিল। হঠাৎ অন্ধকারে নজরে পড়ল, তার পাশের সিটে কে যেন এসে বসেছে।

মানিক?

মানিক মনে করে বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল হঠাৎ। না, মানিক নয়। মানিকের ধারে-কাছেও যায় না লোকটা। দশাসই চেহারা মানিকের, এর চেহারা বেঁটেখাটো, রোগা-রোগা। অন্ধকারে কিছুই তো বোঝা যায় না। তবু আলো যখন খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে বরদা পাশের লোকটিকে লক্ষ করছিল। লোকটা এই সিটে এসে বসল কেন? এটা তো মানিকের সিট। বরদা টিকিট কেটেছে। তাহলে কি টিকিটটা কাউন্টার থেকে সেই ভদ্রলোক বেচে দিলেন নাকি? পয়সাটা পকেটে পুরলেন? কাণ্ড দেখেছ?

বরদা ছবি দেখতে লাগল। সামান্য মন খুঁতখুঁত করলেও কিছু বলা যাচ্ছে না লোকটাকে। সে যদি বলে, আমি টিকিট কিনে এসেছি, তাহলে বরদা কী বলবে! বা এমনও হতে পারে, বরদার বাঁদিকের সিটটা মানিকের। ডান দিকের সিটের নম্বর ওরই। বরদা তো সিটের নম্বর দেখে বসেনি, নম্বরটাও জানে না। আটটা সিট ছেড়ে বসতে বলেছিল, টর্চ দিয়ে সিট দেখিয়ে দিয়েছিল হাউসের লোক, বরদা যথারীতি এসে ঝপ করে বসে গেছে।

বরদারই ভুল হয়ত। ছবি দেখতে লাগল একমনে।

বেশ জমে উঠেছে ছবিটা। ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফি। সেইরকম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সত্যিই রহস্য ধরিয়ে দিচ্ছে।

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতেই বরদা দেখল, লোকটা এবারে একেবারে সিটের মধ্যে ডুবে গেছে। মানে, তার ঘাড় পিঠ সব নরম সিটের মধ্যে ডোবানো, মাথাও যেন দেখা যাচ্ছে না, বরং মাথাটা বুকের দিকে হেলে পড়েছে।

লোকটা হলে ঢুকে ঘুমোতে শুরু করল নাকি?

বরদা বিরক্ত বোধ করল। তার পাশের সিটে বসে একটা লোক ঘুমোবে— এ তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। লোকটা হয়ত বরদারই পয়সায় কেনা টিকিট কাউন্টার থেকে হাতিয়ে এনে হলে ঢুকে ঘুমোচ্ছে। বাড়িতে কি ঘুমোবার জায়গা নেই? আশ্চর্য!

মুখ ফিরিয়ে বরদা আবার ছবি দেখায় মন দিল। পুরনো কোনো বাড়ি,

দুর্গের মতন দেখতে, বিশাল বিশাল ঘর, বিচিত্র সব আসবাব, অজস্র রকমের অস্ত্র, কোনো কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের। একটিও লোক নেই, একেবারে জনহীন পুরী। এইভাবে ঘর থেকে ঘর যেন ঘুরে বেড়াবার পর একজনকে দেখা গেল। চুপসোনো বেলুনের মতন মুখ, বিশাল লম্বা নাক, গর্তে ঢাকা চোখ। একটা বড় কফিনের পাশে বসে আছে লোকটা। কফিনের ওপর অজস্র কারুকার্য।

বরদা আবার একবার চোখ ফেরাল। পাশের সিটের লোকটা একই ভাবে চেয়ারের মধ্যে ডুবে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য! আরও তো অনেক সিট ফাঁকা পড়ে আছে, বরদার ডান দিকে গোটা পাঁচেক, বাঁ দিকে কম করেও সাত-আটটা। হতভাগা মরতে তার পাশে এসে জুটল কেন? অন্য কোনো ফাঁকা সিটে গিয়ে ঘুম মারলেই তো পারত।

মানিকের ওপরই রাগ হচ্ছিল বরদার। মানিকের জন্যেই এই অবস্থা!

যাক গে, মরুক গে! বরদা আবার ছবিতে মন দিল।

ছবি শেষ হয়ে এল। লোকজন উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বরদা একবার পাশের লোকটার দিকে তাকাল। অবিকল একই ভাবে ঘুমোচ্ছে।

বেশ খানিকটা ঠাট্টা ও বিরক্তির সঙ্গে বরদা বলল, "ও মশাই, উঠুন। অনেক ঘুমিয়েছেন।"

কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

বরদা এবার লোকটার কাঁধে ঠেলা মারল আস্তে করে। কোনো ফল হল না।

ততক্ষণে ছবি শেষ। বাতি জ্বলে উঠেছে।

বরদা আলোয় একবার লোকটার দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। এ-রকম বিচিত্র মানুষ সে জীবনেও দেখেনি।

চলে যাবার সময় বরদা আবার একবার ঝুঁকে পড়ে বলল, "এই যে স্যার, উঠুন, ছবি শেষ হয়ে গেছে।"

বলতে বলতে আচমকা বরদার নজরে পড়ল, লোকটার গলার কাছে জামার বোতাম খোলা, গেঞ্জিতে কিসের যেন দাগ ঘন হয়ে রয়েছে। অনেকটা দাগ। প্রায় বুক জুড়ে। রক্তের মতন মনে হচ্ছে। জামাটারও বুকের কাছে সেই দাগ ছড়িয়ে পড়েছে।

বরদার সমস্ত শরীর নিমেষের মধ্যে ঠান্ডা বরফ হয়ে গেল। পা কাঁপতে লাগল থরথর করে, মুখ একেবারে ছাই, গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা যেন লাফাচ্ছিল। লাফাতে-লাফাতে গলার কাছে উঠে আসছিল।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল বরদা। গলা বন্ধ হয়ে গেল। লোক-জন সব চলে যাচ্ছে। কী করবে সে? চেঁচাবে? লোক ডাকবে? তার পাশের সিটে বসে একটা লোক মরে গেল, সে বুঝল না! নাকি এখনও বেঁচে

আছে লোকটা? কেমন করে মরল? স্ট্রোক? হার্টফেল? খুন? রক্ত এলো কোথা থেকে? কে তাকে খুন করবে এই হলের মধ্যে! বরদার পাশেই লোকটা বসে ছিল। একটা শব্দও করেনি।

ভয়ে আতঙ্কে এমন হল বরদার যে, সে আর লোকটার দিকে তাকাতে পারল না। বরং তার মনে হল, এই মুহূর্তে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত। যদি না যায়, তো সে নানারকম ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়বে। থানা, পুলিস, আরও কত রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে!

বরদা যেন বেহুঁশের মতন তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল। এখনও প্যাসেজ দিয়ে লোক যাচ্ছে। ভিড় সামান্য কমেছে। দু-একজন বরদার দিকে তাকাল। হয়ত লোকটার দিকেও। ওই একটিমাত্র লোক, যে এখনও বসে আছে। চোখে পড়ারই কথা। কে আর কবে সিনেমা শেষ হয়ে যাবার পর চেয়ারে বসে-বসে ঘুমোয়।

নিজেকে অন্যের নজর থেকে বাঁচাবার জন্যে বরদা মুখ নিচু করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, মিশে গিয়ে এর-ওর পাশ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছুটল। পালাতে লাগল।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামার সময় বরদা বেশ বুঝতে পারল—তার পা কাঁপছে, মাথা টলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হয়ত সে নিজেই এবার হার্টফেল করবে। হায় ভগবান!

একেবারে নীচে লবিতে নেমে এল বরদা। কোনো খেয়াল নেই। সে পালিয়ে যাচ্ছে। না পালিয়ে তার উপায় নেই।

"বরদা?"

বরদা কিছুই শুনল না। কাচের দরজার বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। সামনে রাস্তা।

"এই বরদা!"

বরদার তখনও হুঁশ নেই।

"কী রে? কালা হয়ে গিয়েছিস নাকি?"

বরদা তাকাল। একেবারে থতমত চোখ। যেন চিনতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, কে ডাকছে।

বরদার কাঁধে হাত পড়তেই চমকে উঠল সে। তাকাল। বিহ্বল দৃষ্টি। "মানিক?"

"ব্যাপার কী রে? কখন থেকে তোকে ডাকছি।"

"তুই?" বরদা ঢোঁক গিলল। গলা কাঠ। ঠোঁট চার্টল, জিব শুকনো। তারপর মানিকের হাত ধরে ফেলল খপ্ করে। কথা বলতে পারল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে।

প্রায় কেঁদে ফেলল বরদা। "মানিক, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ?"

লোকের ঠেলা খেয়ে গাড়ি-বারান্দার মতন জায়গাটায় দাঁড়াল দুজনে।

বরদা ভীত গলায় বলল, "আমার সিটের পাশে একটা লোক বসে ছিল। মারা গিয়েছে।"

"মারা গিয়েছে?"

"বোধ হয় খুন। রক্ত রয়েছে বুকের কাছে। চাপ চাপ। সমস্ত জামাটা ভিজে গেছে।"

মানিক হাঁ করে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল। পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি বরদা? ভূতের ছবি দেখতে এসে ওর ঘাড়ে ভূত ভর করল? মানিক বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস? সিনেমা হলে কেউ খুন হয়?"

"হয়েছে," বরদা বলল, "হয় খুন, না হয় স্ট্রোক।"

"তোর মাথা হয়েছে।"

"লোকটা এখনও চেয়ারের মধ্যে পড়ে আছে।"

"অসম্ভব। কেউ মারা গেলে চেয়ারে বসে থাকতে পারে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে।"

"আমি তাকে বসে থাকতে দেখেছি।"

"তুই খেপামি করছিস।"

বরদা প্রাণপণে মানিকের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। "তুই বিশ্বাস কর।"

মানিক বিশ্বাস করতে চাইল না। একটু ভাবল। "চল্, গিয়ে দেখি।"

চমকে উঠল বরদা। "দেখবি? না না।"

"বাঃ, দেখব না! সত্যি যদি কোনো লোক হলের মধ্যে মারা গিয়ে থাকে—ম্যানেজারকে বলতে হবে।"

বরদা কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেল। "না, চল্, আমরা পালিয়ে যাই।"

মানিক বন্ধুর মাথা সম্পর্কে সন্দেহ করতে লাগল। বলল, "তোর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।—একটা লোক সিনেমা দেখতে এসে হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে, স্ট্রোকও হতে পারে। যদি তাই হয়ে থাকে, ম্যানেজারকে জানানো উচিত।"

হঠাৎ যেন কী খেয়াল হল বরদার। বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "তুই কখন এসেছিস? আমি কাউন্টারে তোর জন্যে টিকিট রেখে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি তোর বদলে অন্য একটা লোক এসে পাশে বসল। বসেই ঘুমোতে শুরু করল। তারপর কখন মারা গেছে।"

মানিক জিভের শব্দ করল, যেন বরদার পাগলামি আর তার সহ্য হচ্ছে না। বলল, "আমার আসতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তুই যে হলে ঢুকে যাবি, তা জানতাম। আমি যখন এলাম, কারেন্ট কাউন্টার ক্লোজ করে দিচ্ছে।

একটা টিকিট চাইলাম। দিতে চাইল না, বলল শো শুরু হয়ে গেছে। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে একটা টিকিট দিল। বলল, "একজন তার বন্ধুর জন্যে রেখে গেছে। তোমার পাশেই তার সিট নাম্বার। পয়সাটা তাকে দিয়ে দিও।"

বরদা বোবা হয়ে গেল। "তাহলে তো আমার রেখে আসা টিকিট।"

মানিক পকেট হাতড়ে টিকিটটা বার করতে লাগল।

"আমি তোর নাম বলে এসেছিলাম।"

"আমায় নাম জিজ্ঞেস করেনি।" পকেট থেকে টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা বার করল মানিক। "তোর টিকিটটা বার কর।"

বরদা পকেটে হাত দিল। হাত তখনও ঠাণ্ডা। ছেঁড়া টুকরোটা পাওয়া গেল।

মানিক নম্বর মেলাল। বলল, "একই রো, পাশাপাশি নম্বর। যাব্বাবা, তা হলে তুই এক জায়গায় আর আমি অন্য জায়গায় বসলাম কেমন করে?"

বরদাও কিছু বুঝতে পারছিল না। এ কেমন করে হয়? একই রো, পাশাপাশি নম্বর, তবু দুজনে দু জায়গায় কেমন করে বসল! নিশ্চয়ই কাছাকাছি বসেনি। বসলে মানিক অন্ধকারেও তাকে খুঁজতে পারত। সিনেমা ভেঙে যাবার পরেও হলের মধ্যে মানিক তাকে দেখতে পেত।

বরদা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "তুই কোথায় বসেছিলি?"

"একেবারে সাইড্ ঘেঁষে পেছন দিকে।"

"আমারটা সামনে ছিল। আশ্চর্য!"

"আমার পাশে দুজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে ছিল," মানিক বলল, "আমি ছেলেটাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সে বলল, কোনো একস্ট্রা টিকিট কাউণ্টারে সে রেখে আসেনি।...তোর কথাও আমার মনে হয়েছিল। তোকে দেখতেই পেলাম না হলে।"

"তা হলে?"

মানিক নিজেও এবার ধাঁধায় পড়ে গেল। ভাবছিল। তারপর বলল, "ভুল করেছে। সিট দেখাবার সময় লোকটা ভুল করেছে। রো পড়তে ভুল করেছে। নয়ত এ-রকম হতে পারে না।"

বরদা চুপ। তার মুখে কথা আসছিল না।

মানিক হঠাৎ বলল, "তুই তা হলে একটু দাঁড়া। আমি খোঁজ নিয়ে আসি।"

"কিসের খোঁজ?"

"নাইট শো শুরু হয়ে আসার সময় হচ্ছে। হলের মধ্যে যদি সত্যিই কেউ মরে পড়ে থাকে, গেটকিপার এতক্ষণে নিশ্চয় জানতে পারবে।...তুই দাঁড়া, আমি আসছি।"

বরদা বাধা দিতে গেল। বারণ করল। কিন্তু মানিক তার আগেই কাচের

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা। তার মনে হচ্ছিল, পালিয়ে যায়। মানিক আরও ঝামেলা পাকাল। বিপদে পড়তে হবে। মরা লোকটাকে এতক্ষণে নিশ্চয় পাওয়া গেছে। ওপরতলায় হইচই লেগে গেছে বোধ হয়। থানায় ফোন করছে ম্যানেজার।

বরদা আর দাঁড়াতে সাহস করল না। রাস্তার দিকে গেল। হাতের ছেঁড়া টুকরোটা ফেলে দিতেই যাচ্ছিল, কী খেয়াল হওয়ায় আবার একবার নম্বরটা দেখল। এটা ফেলে দিলেই হয়। বরদা সিনেমায় এসেছিল তার প্রমাণ কী? না, সে আসেনি। কে মারা গেছে না-গেছে সে জানে না।

টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ওঠাতেই বরদার হঠাৎ নজরে পড়ল, তার প্রায় চোখের সামনে দিয়ে ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে সেই লোকটা হেঁটে যাচ্ছে। অবিকল সেই লোক। বেঁটে, রোগা রোগা। মুখ নিচু করে আপন মনে চলে যাচ্ছে।

বরদা একেবারে থ'। মরা মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল নাকি? চোখের ভুল? ভৌতিক ব্যাপার?

মানিক ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। বেশ খেপে গিয়েছে যেন। বলল, "তুই পাগল হয়েছিস। নির্ঘাত পাগল হয়েছিস। হলে কেউ মারা যায়নি। কেউ নেই। গেটকিপার নাইট শোয়ের লোক ঢোকাচ্ছে।"

বরদা আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখাল। "ওই যে, ওই লোকটা।"

মানিক প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর বরদাকে টান মেরে ছুটতে লাগল। লোকটাকে ধরতে।

ততক্ষণে শরবতের দোকান পেরিয়ে ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে লোকটা। চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

মানিক ছুটতে-ছুটতে বলল, "তুই ঠিক দেখেছিস?"

"ওই রকমই দেখতে।"

"চল্, দেখি।"

লোকটা চৌরঙ্গির রাস্তা পেরোচ্ছিল। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দু পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। এভাবে কেউ রাস্তা পেরোয় না এখানে। যে কোনো সময় চাপা পড়তে পারে লোকটা।

মানিকরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা ওপারে চলে গেছে।

রাস্তা ফাঁকা হতেই মানিকরা আবার ছুটল।

ট্রাম লাইনের গায়ে গায়ে এসে দাঁড়াল লোকটা। তাকাল। যেন দেখল ট্রাম আসছে কিনা!

বরদা আর মানিক ততক্ষণে বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছে।

লোকটা হঠাৎ পেছন দিকে তাকাল। বরদা আর মানিককে দেখতে পেল।

কোথাও কিছু নেই, তবু সেই অদ্ভুত মানুষটা হাসতে লাগল। বিকট হাসি নয়, কেমন যেন মজার হাসি, আমোদ পাবার হাসি।

বরদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানিকও।

বরদা বা মানিক কারও মুখে কথা আসছিল না। দুজনেই বার কয়েক ঢোঁক গিলল।

লোকটিও নির্বিকার। ঠোঁটে চাপা হাসি। মজার চোখ করে দেখছে বরদাদের।

এইভাবে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! অস্বস্তি লাগে। শেষে মানিক গলা পরিষ্কার করার শব্দ করল। বলল, "আপনার সঙ্গে দুটো কথা রয়েছে।" বলে মানিকের খেয়াল হল, লোকটা বাঙালী না অবাঙালী কে জানে। হিন্দী বলতে হবে নাকি? মানিক মনে-মনে হিন্দী সাজাতে লাগল।

লোকটি কিন্তু স্পষ্ট বাংলায় বলল, "বলুন।"

মানিক বলল, "আপনি কি একটু আগে সিনেমা হাউস থেকে বেরিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও সিনেমায় গিয়েছিলাম।" বলে মানিক বরদার দিকে আঙুল দেখাল। "আপনি আমার এই বন্ধুটির পাশের সিটে বসেছিলেন?"

মাথা নেড়ে লোকটি বলল, "বসেছিলাম।"

মানিক এবার বরদার দিকে তাকাল। "তুই বল্ এবার।"

বরদা তখনও নিজেকে ভাল করে সামলে নিতে পারেনি। আমতা-আমতা করে বলল, "আপনি আমার পাশে গিয়ে বসলেন। ছবি তো দেখলেনই না, ঘাড় মুখ গুঁজে ঘুমোলেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু ছবি শেষ হবার পর দেখলাম—আপনার বুকের কাছে রক্তের দাগ। আমি ভেবেছিলাম আপনি খুন হয়েছেন কিংবা মারা গেছেন। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলাম। পরে দেখছি আপনি দিব্যি বেঁচে আছেন।"

এবার লোকটি একটু জোরেই হেসে উঠল। বলল, "আচ্ছা, এই ব্যাপার!" এমন ভাবে বলল যেন ঘটনাটা তার কাছে কিছু নয়।

মানিক অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমার বন্ধুকে আপনি অকারণ ভয় দেখালেন কেন? আপনার মতলবটা কী?"

লোকটা যেন আরও মজা পেয়ে গেল। বলল, "কেউ ভয় পেলে আমি কী করব! যদি বলি, আপনাকে দেখে আমারও ভয় লাগছে। পুলিসের লোক মনে হচ্ছে।"

তামাশা করছে লোকটা। বরদা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "বাঃ, আপনি মরার মতন চেয়ারে ঘাড় মুখ হেঁট করে বসে থাকবেন, আপনার জামায় রক্ত লেগে থাকবে, আর আমি ভয় পাব না?"

আবার ট্রাম আসছে। ভবানীপুরের দিকে যাবে। সামান্য আগে ওপাশের লাইন দিয়ে এসপ্লানেডের ট্রাম চলে গেছে। চৌরঙ্গী ধরে বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি ছোটাছুটি করছিল।

মানিক বলল, "আপনি বড় অদ্ভুত লোক! এমন একটা কাণ্ড করলেন যাতে লোকে ভয় পায়। এখন আবার বলছেন, লোকে ভয় পেলে আপনি কী করবেন। আপনি কি ভেলকিবাজী দেখিয়ে বেড়ান?"

লোকটি এবার আর হাসল না। মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকল দু-চার মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি ওই ট্রামটায় উঠব। ইচ্ছে করলে আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।" বলে একটু থেমে কী মনে করে আবার বলল, "আজ রাত হয়ে গেছে। যদি কাল যেতে চান—আসতে পারেন। আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। কথাবার্তা বলতে চান, বাড়িতে বসে বলা যাবে। কোনো ভয় নেই। আসবেন। অনেক ভেলকি দেখতে পাবেন।"

মানিক ভাবছিল, লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেবে না। ধরে ফেলবে। আটকে রাখবে।

নিজের পকেট থেকেই লোকটি এক টুকরো কাগজ, কোনো রসিদ-টসিদের টুকরো বার করল, ডট পেন। হাতের তালুতে কাগজ রেখে ঠিকানা লিখল। লিখে বরদার দিকে এগিয়ে দিল। "আসবেন কাল। কোনো ভয় নেই। খারাপ লাগবে না।"

ট্রাম কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

মানিক তখনও ভাবছে, লোকটাকে শেষ মুহূর্তে হাত ধরে টেনে রাখবে, যেতে দেবে না।

ট্রাম এল। হাত দেখাল লোকটি। দাঁড়াল ট্রাম।

মানিক হাত বাড়াল, ওকে যেতে দেবে না, হাত টেনে ধরবে।

লোকটার হাত ধরে ফেলেছিল মানিক। ধরামাত্র তার যে ঠিক কী হল বুঝল না. ইলেকট্রিক শক্ লাগার মতন আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝিন-ঝিনিয়ে উঠল। অবশ হয়ে গেল হাত।

ততক্ষণে লোকটা ট্রামে গিয়ে উঠে পড়েছে।

মানিক তখনও হাত ঝাড়ছে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাহুমূল টিপছে। ট্রাম ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল।

বরদা কিছু বুঝতে পারেনি। মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, কী হল?"

মানিক চোখমুখ কুঁচকে বলল, "হাতটা ভেঙেই দিয়েছে রে! সাংঘাতিক জোর ভাই! কোন্ প্যাঁচ মারল কে জানে! বেটা জুডো প্লেয়ার।"

হাত সামলাতে সামলাতে হাঁটতে লাগল মানিক। বরদাও।

"চল্, একটু চা খাই," বরদা বলল, "আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

চায়ের দোকানে এসে বসল দু বন্ধু।

বরদা ঠিকানা-লেখা কাগজটা বার করল। আলোয় রেখে দেখল। বলল, "লোকটার নাম সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক; সদর স্ট্রীটের ঠিকানা।" বলে কাগজের টুকরোটা মানিকের দিকে এগিয়ে দিল।

মানিক নাম-ঠিকানা দেখতে দেখতে বলল, "যাবি?"

বরদা ভাবছিল। "বুঝতে পারছি না।"

"আমার রাগ হচ্ছে। লোকটা আমায় জব্দ করে গেল।"

"তোর চেয়েও আমি বেশি জব্দ হয়েছি। আমি কিছুই করিনি, তবু লোকটা আমায় নার্ভাস করে দিয়েছিল।"

"ওর মতলব কী?"

"ভগবান জানেন।"

"তা হলে চল, কাল যাই।"

বরদা দু হাতে মাথার চুল সামলাতে সামলাতে বলল, "আবার কোন্ ভেলকি দেখাবে কে জানে!"

মানিক বলল, "দেখালে দেখব। বিনি পয়সায় ম্যাজিক।"

"এসব লোক ভাল নাও হতে পারে।"

"মন্দ যদি হয় তবে এদের সত্যিই পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। চল, যাই, কালকেই।"

পরের দিন বিকেলে বরদা আর মানিক সদর স্ট্রীটে গিয়ে হাজির। কলকাতার এই সব পাড়ার চেহারাটাই যেন কেমন, চালতাবাগান বাদুড়বাগান ইত্যাদি পাড়ার সঙ্গে মিল খায় না। সেকেলে বড়-বড় বাড়ি, ভাঙা রেলিং, কোথাও-কোথাও ভাঙা বাড়ির স্তূপ, বড়-বড় গাছ এদিককার চেহারা অন্য-রকম করে রেখেছে। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা।

সিদ্ধেশ্বর ভৌমিকের আস্তানা খুঁজে বার করতে একটু কষ্টই হল। পুরনো একটা বাড়ি ভাঙা চলছে। ইট-কাঠের স্তূপ জমেছে পাহাড়প্রমাণ। তারই গায়ে-গায়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা ছোট বাড়ি। ভাঙাচোরা ফটক খোলাই পড়ে আছে।

বরদারা ভেতরে ঢুকে চার পাশে তাকাল। আগাছার জঙ্গল চারদিকে, দু-চারটে মামুলি গাছও রয়েছে। নিম, জাম। একদিকে বুঝি আস্তাবল ছিল আগে, এখন মস্ত একটা উনুন চোখে পড়ে। বোধ হয় ধোপাখানা হয়েছিল।

বাড়ির এটা পেছন দিক কিনা বোঝা গেল না। আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ঘুরে আসতেই বোঝা গেল বাড়িটা দেড়তলা গোছের। সামনের দিকটা দেখতে খারাপ লাগে না। পাতাবাহারের গাছ। দু-চারটে লতা উঠেছে থাম বেয়ে, কিছু বাগান-সাজানো গাছ নিজের খেয়ালে বেড়ে উঠেছে।

লোকজন চোখে পড়ছিল না। কোথায় সিদ্ধেশ্বর?

ডান দিকে কঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় টালি দেওয়া। দেড়পাক ঘুরে ওপরে উঠেছে। বাড়িটার সামনের দিকটাই তা হলে দেড় বা দু তলা। পেছনটা একতলা।

মানিক বলল, "লোক কই রে?"

বরদাও অবাক হচ্ছিল। বাইরে একটাও লোক নেই কেন? কোথায় গেল সব?

কাঠের সিঁড়ির দিকে এগুতে-এগুতে মানিক বলল, "এটা যদি ভুতুড়ে বাড়ি হয়, কী করবি?"

"ভুতুড়ে বাড়ি?"

"ধর, কালকের সিনেমার মতন হল। একটাও লোক নেই, জন নেই, আমরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে যখন শেষ ঘরটায় গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম বিরাট এক খাটের ওপর চাদরচাপা সিদ্ধেশ্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন?" বলে মানিক ঠাট্টা করে হাসল।

বরদা বলল, "কালকের সিনেমায় কফিনের পাশে একটা গালতোবড়ানো, নেড়া-মাথা লোক বসে ছিল। এখানেও একটা লোক নিশ্চয় থাকবে।"

"যদি না থাকে?"

"পালাব। কেটে পড়ব সেরেফ।...একটা হাঁক দে না?"

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল মানিক। পাশে বরদা। সিঁড়িতে উঠবে কিনা ভাবছিল।

এমন সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নীচেই কোথাও যেন ছিলেন সিদ্ধেশ্বর। সাড়া দিলেন।

বরদারা চমকে উঠেছিল।

এগিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। পরনে পাজামা, গায়ে একটা আলখাল্লা-মতন। হাতে রবারের গ্লাভ্স। গ্লাভ্স খুলতে খুলতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আসুন —আসুন। আপনাদের আসতে দেখেছি। একটা কাজ সারছিলাম। আসুন।"

সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির করে বরদাদের ডেকে নিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে হাঁক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। একটু পরেই ঢ্যাঙা চেহারার একজন বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে।

চেয়ার-টেয়ার পেতে দিতে বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক এ-পাশ ও-পাশ দেখছিল। টানা বারান্দা। বারান্দার গা-লাগিয়ে পর পর তিনটি ঘর, পাশাপাশি। আগের দিনের রেওয়াজ-মতন খড়খড়ি দেওয়া দরজা, দরজার ওপাশে কাচের ভাঁজ-করা দ্বিতীয় দফার দরজা। পরদা ঝুলছিল।

বারান্দায় বিশেষ কিছু নেই। দু চারটে ফুলের টব, পাখির শূন্য খাঁচা। সাদামাটা একটা বেঞ্চি। পুরনো এক মোটর-বাইকও চাকা-খোলা হয়ে পড়ে আছে।

চেয়ার এল।

"বসুন", সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনারা বসুন, আমি ভেতর থেকে আসছি একবার।"

বরদারা বসল।

বিকেল পড়ে গিয়েছে। ঝাপসা হয়ে আসছিল। আর-একটু পরেই অন্ধকার নামবে। এ-রকম এক চুপচাপ, নিঝুম বাড়িতে এসে কেমন যেন লাগছিল বরদার। ভয় না উদ্বেগ, সে বুঝতে পারল না।

মানিক আজ খুব তক্কে-তক্কে আছে। সমস্ত কিছু নজর করছে। কাল সে বড় বোকা বনে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বরকে লক্ষ রাখছে।

মানিক বলল, "কেমন মনে হচ্ছে রে?"

"বুঝতে পারছি না।"

"সিদ্ধেশ্বর খুব ভদ্রতা করছে।"

"তুই ওর ওপর চটে রয়েছিস?" বরদা হাসবার চেষ্টা করল। "আর চটিস না।"

সিদ্ধেশ্বর ফিরে এলেন, বসলেন। বললেন, "আগে চা খান।"

বরদা বলল, "আপনি এখানে একা থাকেন?"

"না। আমি এখানে থাকি না। মাঝে-মাঝে আসি।"

বরদা অবাক-হল। "কে থাকে এখানে?"

"থাকে দু-একজন। আমাদেরই লোক।"

মানিক বলল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমাদের থাকার অন্য জায়গা রয়েছে, কলকাতায় নয়। কাজকর্ম করার সেণ্টার আছে। সেখানে।"

"কিসের সেণ্টার?"

"মুখে বললে আপনারা বুঝবেন না।" নরম করে হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। সামান্য থেমে আবার বললেন, "মানুষের নানারকম লুকনো শক্তি থাকে।

সকলের নয়। কারও-কারও। কেউ কেউ আবার আচমকা একটা শক্তি পায়, আবার হারিয়ে ফেলে। আমরা মানুষের এই অবিশ্বাস্য, কিংবা বলতে পারেন অলৌকিক শক্তি নিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করি। কেন এমন হয়? কী তার কারণ?"

"তার মানে ভুতুড়ে গবেষণা করেন?" মানিক বলল।

"তাও বলতে পারেন।"

এমন সময় ঢ্যাঙা চেহারার লোকটি চা নিয়ে এল। চা আর নোনতা বিস্কিট, কয়েকটা প্যাসট্রি।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে দাঁড়াতে বললেন। বলে বরদাদের দিকে তাকালেন। বললেন, "ওর নাম কেষ্টপদ মণ্ডল। ক্রীশ্চান। আমাদের কাছে আট-দশ বছর রয়েছে। কেষ্টপদ দু-একটা জিনিস পারে যা অন্যে পারে না। দেখবেন?"

মানিক বরদা কৌতূহল বোধ করল। বলল, "দেখি।"

সিদ্ধেশ্বর কেষ্টপদকে বললেন, "মণ্ডল, ওই পাখির খাঁচাটাকে তুমি ছোঁবে না। না ছুঁয়ে দুলিয়ে দাও।"

মানিক বরদার দিকে তাকাল। বরদা মানিকের দিকে। তারপর দুজনেই কেমন অবাক হয়ে কেষ্টপদর দিকে তাকাল।

কেষ্টপদ ধীরে-ধীরে পাখির খাঁচাটার কাছে গেল, গিয়ে হাত খানেক তফাতে দাঁড়াল।

মানিক বরদা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল।

মাথা সোজা করে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কেষ্টপদ। খাঁচাটা স্থির। কেষ্টপদও স্থির।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারও হয়ে এল ধীরে-ধীরে।

হঠাৎ যেন খাঁচাটা নড়ে উঠল। কেষ্টপদ আরও একটু পিছিয়ে এল। নড়তে লাগল খাঁচাটা। দুলতে লাগল। দুলতে-দুলতে জোর হল। যেন ঝোড়ো বাতাসে খাঁচাটা দুলছে।

বরদা স্তম্ভিত। মানিক কাঠ হয়ে গেল।

যেন কোনো ভৌতিক শক্তিতে অদ্ভুতভাবে দুলছিল খাঁচাটা—অথচ বারান্দার কোথাও কোনো ঝোড়ো বাতাস নেই।

সদর স্ট্রীটের বাড়ি থেকে উঠতে উঠতে রাত হল। সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাদের। এই রাস্তাটা ভাল নয়।"

যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়; সিদ্ধেশ্বর কোনো ভেলকিঅলা নন, তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করার মতন মানুষ নন। ভদ্র, মার্জিত, বুদ্ধিমান মানুষ। কথা বলতে পারেন চমৎকার। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে হয়, ভালও লাগে। অনেক গল্প করলেন তিনি। নিজের জীবনের কথাও বললেন সামান্য। কলকাতায় জন্ম, বাবা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়ার, ছেলেবেলায় বিস্তর ঘুরেছেন বাবার সঙ্গে, বদলির চাকরি ছিল বাবার। মা একেবারে মাটির মানুষ। ধর্মকর্মে মায়ের বাতিক ছিল খুব। গোরখপুরে থাকার সময় এক সাধুজী মায়ের কাছে খুব আসতেন, তিনি ছিলেন সূর্যপূজারী। সিদ্ধেশ্বর ছেলেবেলায় দেখেছেন, সাধুজী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কখনও কোনো ছায়ার তলায় দাঁড়াতেন না, অন্নজল গ্রহণ করতেন না, সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মেঘ-বাদলের দিনেও তাঁকে ঘরে ঢোকানো যেত না। এই সাধুজী বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সাধকপুরুষ। তিনি এমন অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেতেন আচমকা, যা কোনো মানুষই দেখতে পায় না। সাধুজী বাবাকে বলেছিলেন, বাবা ব্রিজ তৈরির কাজ করতে গিয়ে রেল অ্যাকসিডেন্টে মারা যাবেন। বাবা সেইভাবেই মারা যান।

সাধুজী নিজের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিকে বলতেন অভিশাপ। কেমন করে এটা তাঁর মধ্যে এসেছিল জানেন না। এই জ্ঞান তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তিনি নিজে গঙ্গায় ডুবে মারা যান। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবার মতন এঞ্জিনিয়ার না হয়ে ডাক্তার হবার শখ নিয়ে মেডিক্যাল পড়তে ঢোকেন। বছর তিন-চার পড়ার পর ছেড়ে দেন। তারপর টোটো করে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায়, ছোটখাট কাজকর্মও করেছেন। শেষে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে। তিনি মানুষের অস্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন অনেক দিন ধরে। সেই ভদ্রলোকই পরে সিদ্ধেশ্বরকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। তখন থেকেই সিদ্ধেশ্বর তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়ে গেছে অনেক, সিদ্ধেশ্বরকেই হাজার রকম জিনিস দেখাশোনা করতে হয়।

বরদা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের সেই জায়গাটা কোথায়?"

সিদ্ধেশ্বর জায়গার নাম বললেন। বরদা জীবনেও নাম শোনেনি অমন জায়গার। বলল, "কোথায় সেটা?"

"দুমকার কাছেই। মাইল কয়েক দূর।"

"কী নাম?"

"পি পি রিসার্চ সেণ্টার।"

"মানে?"

"প্যারাসাইকিক ফেনামেনন রিসার্চ সেণ্টার। নামটায় সব বোঝায় না, তবু ওই নামই রয়েছে।"

মানিক অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। বলল, "আপনি সিনেমা হাউসে বসে যে ভেলকি দেখালেন, আপনাদের কেষ্টপদ যে কাণ্ডটা দেখাল—এ সবই কি ওই পি পি?" বলে মজা করার মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "খানিকটা তাই।...এসব আপনাদের বিশ্বাস করার কথা নয়। একসময়ে আমিও করতে পারতাম না। আজকাল পারি। আমরা সকলেই যে যার মতন একটা ছোটখাট জগৎ নিয়ে বাস করি। বড় জগৎ অন্য রকম। সেখানে কত কী আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায় আমরা জানি না। বুঝি না। অবিশ্বাস করি। অবিশ্বাস করতে পারলে কথা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি অবিশ্বাস না করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে তবে কী হয়।"

বরদা মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। বলল, "সেদিন একটা বিদেশী কাগজে একজনের কথা পড়ছিলাম; ছবিও দেখছিলাম। লোকটার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা; কাঁটা, চামচ, ছুরি বেঁকিয়ে দিতে পারে শুধু চোখের দৃষ্টিতে।"

মানিকেরও যেন মনে পড়ল, এ-রকম একটা খবর সে কাগজে পড়েছে। বলল, "আমিও পড়েছি কোথাও। কাগজের খবর বলে বিশ্বাস করিনি।"

"কেন?" বরদা বলল।

"কাগজে কত গালগল্প বেরোয়; কে আর বিশ্বাস করে।"

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার শেষে এসে পড়েছিল বরদারা।

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমরা যদি আপনাদের ওখানে যাই—আমাদের নিয়ে যাবেন? দেখতে দেবেন?"

কথার জবাব না দিয়ে সিদ্ধেশ্বর চৌরঙ্গি রোডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু ভাবছিলেন। তারপর খুবই আচমকা মানিককে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টা বাজল?"

মানিক ঘড়ি দেখল হাতের; সময় বলল।

সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনাদের দেরি হয়ে গেল।

আমারও কাজ রয়েছে। আচ্ছা, আসুন তা হলে," বলে সিদ্ধেশ্বর হাত তুললেন, বিদায় জানাবার ভঙ্গি করে।

বরদা বলল, "আপনি আমাদের নিয়ে যেতে চান না?"

"কোথায়?"

"আপনাদের ওখানে?"

"চাই বই কী! যেতে চাইলেই যেতে পারবেন।" সিদ্ধেশ্বর আবার হাত তুলে হাসলেন। "আমি আর দাঁড়াব না, যাই।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে লাগল।

মানিক বলল, "তুই চট্ করে যাবার কথা বলতে গেলি কেন?"

বরদা বলল, "বললাম।"

"বললাম! মুখে এল আর বলে ফেললি?"

"কেন, বললে ক্ষতি কিসের?"

"যাবি তুই?"

"যেতে ইচ্ছে করছে। মানে, একবার গিয়ে দেখে এলে হয়।"

"এমন করে বলছিস যেন জায়গাটা বালিগঞ্জ কি বেহালা; ঝট করে গিয়ে দেখে আসা যায়।"

বরদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তুই যাই বল, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।"

"গাঁজাখুরিও হতে পারে।"

"মানে?"

"যদি গিয়ে দেখিস সব বাজে, ধোঁকা..."

"কাল আমি সিনেমা হাউসে যা দেখেছিলাম সেটা ধোঁকা হতে পারে—আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু আজ কেষ্টপদ যা দেখাল, তুই নিজের চোখে দেখলি। অত বড় একটা পাখির খাঁচা কেউ ফুঁ দিয়ে কিংবা জোরে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে দোলাতে পারে?"

মানিক মাথা নাড়ল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনো কায়দা আছে—আমরা যা ধরতে পারিনি।"

বরদা বলল, "কোনো কায়দা ছিল না।"

"তুই কেমন করে জানলি?"

কথার জবাব দিল না বরদা।

আরও একটু এগিয়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল বরদা। হাত বাড়িয়ে দাঁড় করাল। বলল, "চল, একটু ট্যাক্সি চড়া যাক।"

মানিকের ইচ্ছে ছিল না ট্যাক্সি চড়ার, অকারণ পয়সা খরচ। বরদা বরাবরই বেহিসেবী। বাড়ির অবস্থা ভাল। অভাব-টভাব তো বুঝল না কোনোদিন। মানিক এভাবে পয়সা ওড়াতে পারে না। ক্ষমতাও নেই তার।

ট্যাক্সিতে উঠে বরদা ড্রাইভারকে শ্যামবাজারের দিকে যেতে বলল। বলে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। "নে।"

সিগারেট ধরাল দুজনে। মানিক হাই তুলল বড় করে।

"সিদ্ধেশ্বরকে তোর ভাল লাগেনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল বন্ধুকে।

মানিক চট করে জবাব দিল না। ভাবছিল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"সিদ্ধেশ্বরকে? কেন?"

"কেন তা বলতে পারব না। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের কোনো মতলব রয়েছে।"

"মতলব?"

"অভিসন্ধি।"

"কিসের অভিসন্ধি?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না। এত লোক থাকতে তোকে ওই ভেলকি দেখাবার কী ছিল কাল? আজকেই বা কেন—"

মানিককে কথা শেষ করতে না দিয়ে বরদা বলল, "তুই এখনও চটে রয়েছিস সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওপর।"

"চটে নেই। আমার ভাল লাগছে না।...সিদ্ধেশ্বরের মোটিভ কী?"

"আমার কিন্তু ভালই লেগেছে ভদ্রলোককে।"

"বুঝতে পারছি। তোকে এরই মধ্যে বশ করে ফেলেছেন সিদ্ধেশ্বর।" বলে মানিক সামান্য ঠাট্টা করে হাসল। আবার হাই তুলল। বলল, "বড় ঘুম-ঘুম পাচ্ছে রে!"

দেখতে দেখতে ট্যাক্সিটা মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি এসে গেল। সামান্য ভিড় এখানটায়। ট্রাফিক লাইটের জন্যে কিছু বাস-টাস, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ট্যাক্সি থামল।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে বরদা বলল, "আমার এখন ঢালা ছুটি। চল না, দিন কতক বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায়? সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টার থেকে?"

"দুমকা-টুমকা ভাল জায়গা শুনেছি।"

"তুই যা। আমার উপায় নেই। আমি পরের গোলামি করি।"

"ছুটি নে।"

"ছুটি?"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনু দিয়ে যেতে যেতে আচমকা বাঁ দিক করে ট্যাক্সি থেমে গেল। নেমে পড়ল ড্রাইভার। বনেট খুলল। খুটখাট করল একটু। ফিরে এসে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল।

মানিক জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

মাথা হেলিয়ে ড্রাইভার বলল, ঠিক আছে।

বরদা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। কলকাতা বড় অদ্ভুত শহর। এত বড় রাস্তার এই দিকটা এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সারাদিন পরে যেন রাস্তাটাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

মানিক নামবে বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে; বরদা যাবে গ্রে স্ট্রীট। ট্যাক্সিটাকে ডান দিকে নিতে বলল বরদা। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরে যাবে, পথে মানিককে নামিয়ে দেবে।

বাড়ি ফিরে বরদা নিজের ঘরে চলে গেল। তার ঘর তেতলায়। পুরনো আমলের বাড়ি, দেখতে অনেকটা মেসবাড়ির মতন মনে হয় ভেতরটা। লোক-জনও কম নয় বাড়িতে। বরদা অনেক দিন আগেই তেতলায় উঠে গেছে। ছাদটাদ রয়েছে তেতলায়। অনেক ফাঁকা। আলো বাতাস পাওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল বরদা। জামা-প্যান্ট বদলাবে। পকেট থেকে পয়সা-কড়ি, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, রুমাল বার করার সময় তার হাতে ভাঁজ করা কাগজ উঠে এল।

কী ব্যাপার?

কাগজটা খুলল বরদা। খুলে অবাক হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হল না। ভাল করে দেখল।

সিদ্ধেশ্বর এই কাগজের টুকরোটা কখন যেন পকেটের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, কিংবা গুঁজে দিয়েছেন, বরদা বুঝতেই পারেনি।

আলোয় মেলে ধরে লেখাটা পড়ল বরদা।

"আমি পরশু দিন—বুধবার ফিরে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনার বন্ধু মানিকবাবু নিজেকে যতটা চালাক মনে করেন ততটা চালাক তিনি নন। তিনি ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গে আসতে পারেন। না এলেও কোনো ক্ষতি নেই। আপনার সব দায়িত্ব আমার। কোনো ভয় নেই। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি জানি, আপনি যাবেন। আগামী কাল বিকেলে আপনি একবার নিউ মার্কেটের সামনে আসবেন। পাঁচটা নাগাদ। কথা হবে। যদি না আসেন, বুঝব আপনি যেতে অনিচ্ছুক।"

বরদা বার কয়েক চিঠিটা পড়ল।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে দেবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর যেন পেছনে কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শিউরে উঠে ঘাড় ঘোরাল বরদা—কেউ নেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। কে যেন আসছে।

ছোট ভাই সারদা এল ছুটতে ছুটতে। "দাদা, শিগগির এসো। মানিকদা তোমায় ফোন করছে। মানিকদার কী যেন হয়েছে।"

বরদা আঁতকে উঠল। ফোন ধরতে ছুটল নীচে।

ফোন ধরে বরদা বলল, "হ্যালো—মানিক—মানিক?"

ও পাশ থেকে কার যেন গলা পাওয়া গেল, ভাঙা গলা, সামান্য জড়ানো। মানিকের গলা বলে মনে হয় না।

জড়ানো, ভাঙা-ভাঙা গলায় মানিক বলল, "বরদা, বাড়ি ফিরে আসার পর আমার চোখে কী যেন হয়ে গেছে। ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর আমাদের কিছু খাইয়ে দিয়েছে চায়ের সঙ্গে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে চোখে। ঘুম পাচ্ছে।"

বরদার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। বলল, "কী বলছিস তুই! আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি ঝাপসা দেখছি।"

"ডাক্তারের কাছে যা।"

"ডাক্তারখানা থেকেই ফোন করছি।"

বরদা কোনো কথা খুঁজে পেল না। মানিক, বরদা, সিদ্ধেশ্বর—একই সঙ্গে চা খেয়েছে। মানিককে কিছু খাইয়ে দেবার সুযোগ তো সিদ্ধেশ্বরের ছিল না। তবে?

"আমি কি তোর বাড়িতে আসব?"

"কাল সকালে আসিস। আজ এসে কী করবি।"

"তোকে কিছু খাওয়াবে কী করে? আমরা একই সঙ্গে চা খেয়েছি।"

"জানি না। সিদ্ধেশ্বর সবই পারে। আমার চোখ যদি কাল সকালে ঠিক না হয়ে যায়, আমি ওকে দেখে নেব।"

বরদা ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না।

নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বরদার পা ধরে গেল। সিদ্ধেশ্বরের দেখা নেই। আজ সে একলা। মানিক নেই। আসতে পারবে না মানিক। তা ছাড়া, সিদ্ধেশ্বর বরদার সঙ্গেই দেখা করতে চেয়েছেন, মানিকের সঙ্গে নয়।

অপেক্ষা করতে করতে বরদা যখন বিরক্ত বোধ করছে, সিদ্ধেশ্বর হাজির হলেন।

বরদা বলল, "আমি ভাবছিলাম আপনি বোধহয় আজকের কথা ভুলেই গেলেন।" ঠাট্টার গলাতেই বলল বরদা, সামান্য বিরক্তিও রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম। কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"পাঁচটার আগেই।"

"একটু দেরি হয়ে গেল...। চলুন আমরা বসি। আপনাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না।"

পা বাড়াল বরদা। "কোথায় বসবেন?"

"আসুন। বসার জায়গা রয়েছে।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি মানিককে কাল কি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

ঘাড় ফেরালেন সিদ্ধেশ্বর। "কেন?"

"বাড়ি ফিরে ও চোখে খুব ঝাপসা দেখছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে চোখে দিয়েছে।"

"সকালে কেমন আছেন?"

"ভাল। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

সিদ্ধেশ্বর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলেন। গ্লোব সিনেমার পাশের গলি দিয়ে নিয়ে চললেন বরদাকে।

বরদার সন্দেহ হল; মানিকের কথায় সিদ্ধেশ্বর অবাকও হলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। তা হলে কি উনি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন চায়ের সঙ্গে?

বরদা বলল, "মানিককে আপনি কোনো ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "না, আমরা কিছুই খাইয়ে দিইনি। আপনাদের ছোটখাট যা হবে, সবই আমাদের দুষ্কর্ম, এ-কথা কেন ভাবছেন? মানিক-বাবুর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।"

"তা হলে?"

"হয়ত ওঁর কোনো চোখের রোগ আছে।"

গলি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বরদাকে ডাকলেন। এমন বাড়ি বরদা জীবনে দেখেনি। কত কালের পুরনো বাড়ি, সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ইঁদুর আর ছুঁচোর আড়ত, ভাঙাচোরা কাঠের সিঁড়ি, গুদোমখানার দুর্গন্ধ, আর আলো না থাকার মতন, নীচে বড়-বড় ঘর, কারা থাকে কে জানে। কেমন একটা শুকনো চামড়ার গন্ধও আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বরদা বলল, "এ বাড়িতে কারা থাকে?"

"বেশির ভাগ থাকে কেরলের লোক, নিউ মার্কেটের পেছনে যাদের বেতের জিনিসপত্রের দোকান। অনেকের গুদোমঘরও নীচে।"

তেতলায় এসে বরদা হাঁফ ছাড়ল। আলো-বাতাস পাওয়া গেল এতক্ষণে।

একটা ঘরে এসে বরদাকে বসালেন সিদ্ধেশ্বর। মোটামুটি বড় ঘর, মাথার ওপর পুরনো আমলের কড়ি-বরগা। পাখা ঝুলছে। বাতিও সিলিং থেকে ঝোলানো। বসার ব্যবস্থা বলতে মোটা মোটা সেকেলে সোফাটোফা, একপাশে একটা লোহর খাট, বিছানা পাতা রয়েছে খাটে। কোনার দিকে টেবিল। তার ওপর যাবতীয় জিনিস জড় করা।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বসিয়ে একটু বাইরে গেলেন; ফিরে এলেন আবার।

"কফি খান। রবিন ভাল কফি করে।"

বরদা ক্লান্তিবশত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল।

সিদ্ধেশ্বর বসলেন। মুখোমুখি।

সামান্য চুপচাপ থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি কিছু ঠিক করলেন?"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "যেতে তো ইচ্ছে করে।"

"চলুন তাহলে?"

"একলা-একলা যেতে ভাল লাগে না। মানিক যদি যায়—"

"আপনি ভয় পাচ্ছেন!"

"না না, ভয় কিসের!" মাথা নাড়ল বরদা।

"মানিকবাবু চাকরি করেন, তাঁর যদি সুযোগ না হয়?"

"আমি ওকে রাজি করিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "মানিকবাবু যেতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু উনি যেতে না পারলেও আপনি চলুন।"

বরদা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। কাল রাত্রে সে অনেকক্ষণ সিদ্ধেশ্বরের কথা ভেবেছে। মানুষটিকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না; আবার এমন কথাও মনে হয়, এত লোক থাকতে বরদাকে দুমকা নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর আগ্রহ কেন? অবশ্য, বরদা নিজেই খানিকটা উৎসাহ ও কৌতূহল যে প্রকাশ করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

বরদা বলল, "আমাকে আপনি নিয়ে যেতে চাইছেন কেন? আমি তো আপনাদের ব্যাপার কিছু বুঝব না, শুধু যাব আর দেখব।" বলে বরদা হালকা করে হাসল, "তা ছাড়া আমার কোনো বিশেষ ক্ষমতাও নেই যে, আমায় নিয়ে গবেষণা করবেন।"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে লক্ষ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না কথার। পরে বললেন, "আপনি যেতে না-চাইলে যাবেন না, তাতে কী! তবে যদি যান, অনেক কিছু দেখতে পাবেন, যা আগে কখনও দেখেননি।"

বরদা হেসে ফেলল। হালকা করেই বলল, "যা দেখেছি এতেই অবাক

হয়েছি, স্যার।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "এ-সব কিছু না। আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার আপনি দেখতে পাবেন।...আপনি কি এমন কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত দেখেছেন যার বাঁ হাতের ওপর রঙ দিয়ে উল্কি পরিয়ে দিলে সেটা ডান হাতেও ফুটে উঠবে? শুধু উল্কিই বা কেন, ধরুন তার বাঁ হাতে আপনি জোরে মারলেন কিছু দিয়ে—কালসিটে ফুটে উঠল। একটু পরে দেখবেন তার ডান হাতের সেই একই জায়গায় আর-একটা কালসিটে ফুটে উঠেছে।"

বরদা অবাক হয়ে সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাতা পড়ল না চোখের। কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাতের সম্পর্ক কী? কেমন করে তা হবে?

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "আমাদের ওখানে এমন লোকও আছে, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না কিন্তু এক-একদিন সে কিসের এক আশ্চর্য শক্তি পায়, একেবারেই আচমকা—তখন সেই লোকটি আপনাকে হাত তুলে আকাশের তারা পর্যন্ত চিনিয়ে দিতে পারে, অনেক দূরের যে-কোনো শব্দ সে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে।"

এমন সময় সাধারণ একটা বেতের গোল ট্রে নিয়ে একটা লোক ঘরে এল।

বরদা লোকটিকে দেখল। দেখার মতন চেহারা। লম্বা-চওড়া চেহারা, যেন লোহায় গড়া, কুচকুচে কালো রঙ গায়ের, মাথার চুল ছোট-ছোট, কোঁকড়ানো, নাকটা ভাঙা-ভাঙা, সাদা ধবধবে দাঁত, একদিকের কান নেই, মানে কান-কাটা গোঁছের। গায়ে তার জাহাজী ডোরাকাটা গেঞ্জি, পরনে প্যান্ট।

ট্রে নামিয়ে রাখল লোকটি। দু মগ কফি, আর প্লেটে কয়েকটা প্যাসট্রি।

দাঁড়াল না লোকটি, চলে গেল।

বরদা বলল, "কে এই লোকটা?"

"ওর নাম রবিন, ঝাঁঝা অ্যাংলো কলোনিতে থাকত একসময়। রেলে চাকরি করত, ফায়ারম্যান ছিল। বড় সাংঘাতিক লোক। দুর্ব্যবহার করার জন্য চাকরি যায়। চাকরি-বাকরি যাবার পর থেকে দুষ্কর্ম করে বেড়াত। পরে আমাদের কাছে এসেছে।"

বরদা কফির মগ তুলে নিতে-নিতে বলল, "ওরও কি কোনো বিশেষ ক্ষমতা আছে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন একটু হাসলেন। "তা আছে বইকি।"

"কী ক্ষমতা?"

সিদ্ধেশ্বর প্যাসট্রির প্লেটটা তুলে বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "বললে আপনি ভয় পাবেন। অবশ্য আপনার ভয় পাবার কোনো

কারণ নেই। এই ধরুন আপনি—আপনাকে কোনো কারণে আমাদের দরকার। রবিনকে হুকুম করলেই সে আপনাকে যেমন করে হোক আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।"

বরদার হাত কেঁপে উঠল। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল সিদ্ধেশ্বরের দিকে। ঢোঁক গিলল; বলল, "লোকটা গুণ্ডা?"

"তা বলতে পারেন।"

"আপনারা গুণ্ডা পোষেন?"

"না, তা নয়। আমরা চোর ডাকাত স্মাগলার নই যে, আমাদের গুণ্ডা পুষতে হবে। তবে আমাদের দু-একজন শত্রু রয়েছে। তারা নানাভাবে ক্ষতির চেষ্টা করে আমাদের। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে রবিনের মতন দু-একজনকে রাখতে হয়।"

বরদা কফিতে চুমুক দিল। হাতে প্যাসট্রি।

সিদ্ধেশ্বরও কফি খেতে লাগলেন।

বরদা বলল, "এই বাড়ি—মানে ফ্ল্যাটটি কি আপনাদের?"

"হ্যাঁ। এখানে যিনি থাকেন তিনি এখন কলকাতায় নেই। রবিনও এখানে থাকে।"

"কে থাকে এখানে?"

"পালসাহেব। পালসাহেব একজন প্যাথলজিস্ট। আমাদের লোক। খানিকটা অ্যাবনরমাল। কাজকর্ম ভাল করেন। তবে খেপামিটা মারাত্মক।" সিদ্ধেশ্বর হাসলেন।

বরদা বুঝতে পারছিল না তাকে সিদ্ধেশ্বর কোনো ফাঁদে ফেলছেন কি না! প্রথম থেকে দেখলে মনে হয়, ধীরে-ধীরে যেন একটা জাল বরদার চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন সেটা গুটিয়ে নিতে চাইছেন সিদ্ধেশ্বর। আবার তেমন করে খুঁটিয়ে না দেখলে মনে হবে, যা ঘটেছে সবই আচমকা। বরদারা নিজেরাই সিদ্ধেশ্বরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সিদ্ধেশ্বর তাদের টেনে নিয়ে যাননি। কিন্তু সেই সিনেমা হাউস থেকে শুরু করে পরপর যা হয়েছে তা কি বরদাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নয়?

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু, যদি আমি না যাই, আপনি কি ওই রবিন গুণ্ডাকে আমার পেছনে লাগিয়ে দেবেন?"

সিদ্ধেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন, জিভ কাটার ভঙ্গি করলেন। "আরে ছি ছি—তাই কি হয়? আপনি নিজের ইচ্ছেয় যাবেন, না হয় যাবেন না।"

বরদা নিশ্বাস ফেলল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভরসা হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলছি, আপনার সমস্ত দায়িত্ব আমার।

আমরা চোর ডাকাত খুনের দল নই। আমরা মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের মতলব করি না। আপনার ক্ষতি আমরা কেন করব! আপনি আমার ওপর ভরসা করে চলুন। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বরদা প্যাসট্রিটা শেষ করল। কফিতে মুখ দিয়ে বলল, "বাড়িতে একবার বলতে হবে।"

"বলবেন।"

"বাড়ির লোক যদি রাজি না হয়?"

"বেড়াতে যাচ্ছেন বললে কেন রাজি হবেন না। আপনি ছেলেমানুষ নন।"

বরদা আর কোনো কথা বলল না।

কফি খাওয়া শেষ হল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "একটা কথা আপনাকে এত আগেভাগে বলা উচিত নয়, তবু বলে রাখি। আপনাকে আমি আমার বন্ধু হিসেবেই নিয়ে যাব। কিন্তু সেখানে বিশেষ একজনের কাছে আপনার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর আচরণ করব না। বরং উলটো আচরণও করতে পারি। আপনি আমার অভিনয় মেনে নেবেন। নিজেও সেই রকম অভিনয় করবেন। আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন, চড় লাথি মারবেন, গালমন্দ করবেন। আপনি যত ভাল অভিনয় করবেন—ততই আমার সুবিধে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আজকাল সব ব্যাপারেই ভেজাল জোটে। আমাদের ওখানে কখনো-সখনো এই রকম জাল-মানুষ এসে যায়। হয় আমাদের ভুলে, না হয় তাদের কৃতিত্বে। আজ প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে এই রকম এক জাল প্রেত-বিশারদ এসে জুটেছে। আমার বিশ্বাস, লোকটা আমাদের এখানকার দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব করেছে। যদি পালিয়ে যেতে পারে, মানুষকে ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়ে রাতারাতি দেদার পয়সা কামিয়ে নেবে। আমাদের দেশে ভুতুড়ে ব্যাপারের বাজার খুব ভাল। লোককে ঠকানো সহজ। এ-দেশের মানুষ আরও সহজে ঠকে।"

বরদা আবার একটা সিগারেট ধরালো। বলল, "আপনি কি জাল ধরবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারব?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলিয়ে বললেন, "পারবেন।" তারপর শার্টের পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। খামের মধ্যে ফোটো ছিল। ফোটোটা বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে ফোটোটা নিল বরদা। পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো।

চোখের সামনে ফোটোটা ধরতেই বরদা চমকে উঠল। শব্দ করল অস্ফুট, পাতা আর পড়ে না চোখের। বুক ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেল বরদার। বরদা তোতলার মত করে বলল, "এ ছবি কার? আমার মতন দেখতে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এই ছবি যার, সে হল জাত প্রেতবিশারদ। আপনার মতনই দেখতে, কিন্তু সামান্য তফাত আছে। এর নাম মহাদেব দাশ। মহাদেবকে আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই। ও একটা জোচ্চোর বদমাশ। যে মতলব নিয়ে সে আমাদের কাছে এসেছে তার সেই মতলব আমি জানতে পেরেছি।...বরদাবাবু, আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা কেমন নির্বোধের মতন সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারল না।

সিদ্ধেশ্বর অনুনয়ের মতন করে বললেন, "আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা যেন হুঁশ ফিরে পেল। বলল, "আপনি কি এই উদ্দেশ্যে আমার পিছু ধরেছেন?"

"আমি একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলাম," সিদ্ধেশ্বর বললেন। "সেদিন যখন সিনেমা হাউসের কাছে অন্যমনস্কভাবে ঘোরাঘুরি করছিলাম, আপনাকে দেখতে পেয়ে যাই আচমকা। তখন থেকেই আমার মাথায় একটা অভিসন্ধি ঘুরছিল।"

"তার মানে আমাকে আপনি ফাঁদে ফেলেছেন।"

"তা নয়। তবে আপনি আমার একটা সুযোগ করে দিতে পারেন এইমাত্র।...আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা যা করি গবেষণার জন্যেই করি, ভেলকি দেখিয়ে পয়সা কামাবার জন্যে নয়।"

"এই ছবিটা কি আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আগেই?"

"না। আপনাকে দেখার পর সেইদিন রাত্রেই আমি সদর স্ট্রীট থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পি সি রিসার্চ সেন্টারে। আজ সকালে সে ছবি নিয়ে ফিরেছে।"

বরদা আবার একবার খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল। মহাদেব দাশ যদি কোনো-দিন কলকাতায় এসে বরদার বাড়িতে ঢুকে পড়ে, বাড়ির লোক বোধ হয় সহজেই লোকটাকে বরদা বলে ধরে নেবে। আর যদি তখন বরদা বাড়ি থাকে—দুই বরদা নিয়ে এক হই-চই পড়ে যাবে।

হঠাৎ কী মনে করে বরদা হেসে ফেলল। তারপর সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। বলল, "আমি যাব। আপনার সঙ্গেই।"

দুমকা নয়, দুমকার কাছাকাছি। মানিক থাকলে এতক্ষণে নাচত, বলত—ফার্স্ট ক্লাস জায়গা রে! সত্যি চমৎকার, চোখ জুড়িয়ে যাবার মতন। বরদা কলকাতার পোকা; জন্মকর্ম খাস কলকাতায়, দু পুরুষ ধরে উত্তর কলকাতার বাসিন্দে। কলকাতায় থাকতে-থাকতে চোখের ওপর কেমন একটা পরদা পড়ে যায়, গলি রাস্তা ফুটপাথের দোকান ট্রাম বাস দেখতে-দেখতে এমন হয়ে যায় চোখের অবস্থা যে, আলো রোদ মাঠ গাছপালা কিছুই যেন আর সইতে চায় না চোখে।

বরদা বেশ বুঝতে পারছিল তার চোখের ময়লা পরদাটা পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে। ওরা রামপুরহাটে নেমেছিল শেষ বিকেলে। সিদ্ধেশ্বর একলা এলে আগেই আসতেন। বরদার জন্যে একটা দিন পিছিয়ে দিলেন, দিয়ে বরদাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন।

রামপুরহাট থেকে বাস। কলকাতার মতন নয়, দেখলেই বোঝা যায় মফস্বলের বাস। তবু সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির পেলেন। চেনাজানা লোক তিনি। বাস-বোঝাই যাত্রীর মধ্যেও বরদাদের বসার ভাল জায়গা জুটেছিল।

বরদা কলকাতার পোকা হলেও দু এক বছর অন্তর বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে। কখনো পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, কখনো বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে। মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি তার দেখা; সে হাজারিবাগের জঙ্গলেও ছিল এক রাত। কাজেই এই নতুন জায়গা একেবারে অচেনা ঠেকল না। সেই রকমই ধুধু উঁচুনিচু মাঠ, রাশি রাশি গাছ, ছোট ছোট বালিয়াড়ির মতন স্তূপ, আর টাটকা বাতাস যেন চারদিকে আপন খেয়ালে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাতাস, মাটি, গাছপালার গন্ধই কী সুন্দর।

বাস থেকে নামতে-নামতে বিকেল পড়ে গেল।

মালপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। বরদা একটা লম্বা-চওড়া সুটকেস নিয়েছে মাত্র। সিদ্ধেশ্বর বলেছিলেন, বিছানাপত্র নেবেন না—সব ব্যবস্থা রয়েছে। বরদা জামা-কাপড় আর কিছু টুকিটাকি নিয়ে সুটকেসটা ভরিয়ে ফেলেছে। সিদ্ধেশ্বর নিজেও অনেকটা ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, তাঁর হাতে একটা চামড়ার কিট-ব্যাগ।

বাসটা চলে গেল দুমকার দিকে।

সিদ্ধেশ্বর একটা টাঙা ভাড়া করলেন। বাস থামার জায়গাটাকে গ্রাম-

গ্রাম লাগল। দু-চারটে পাকা বাড়ি ছাড়া বাদবাকি সবই খাপরার-চাল-ছাওয়া বাড়ি। পাঁচ-সাতটা দোকান। একপাশে হনুমান মন্দির। গোটা-দুই মাল বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে আছে। আলু পিঁয়াজের কেমন একটা গন্ধ আসছিল লরি থেকে।

টাঙায় উঠে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখান থেকে মাইল দুই।"

বরদা কিছু বলল না; ছেলেমানুষের চোখ করে চারদিক দেখছিল।

টাঙা চলতে শুরু করলে বরদার আবার মানিকের কথা মনে পড়ল। মানিক আসতে পারল না। বরদা একলা আসে এটাও তার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু সব কথাবার্তা শুনে সে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে বলল, "ঠিক আছে, তুই যা। আমিও পরে আসব। কোনো ঝামেলা বুঝলে চিঠি লিখবি, আমি সুশোভনকে সঙ্গে করে চলে যাব।"

সুশোভন বরদাদের আর-এক বন্ধু। দারুণ ছেলে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সাহস। পুলিসে চাকরি করে।

বরদা অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল। তার ঠিক ভয় করছিল না। সে এমন কিছু সাহসী ছেলে নয়, বরং অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু দু-তিনটে দিন সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষটির প্রতি তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর খারাপ লোক নন। মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান না। তবে ওই যে—ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে মাথা ঘামান এটাই যা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। নয়ত অন্য কোনো দোষ তাঁর নেই।

সন্ধের কালচে ভাবটা জমে আসার আগে যেন মনে হল ঝাপসা ভাবটা ফিকে হয়ে আলো ফুটছে। বরদার খেয়াল হয়নি। আকাশের দিকে তাকাতেই চাঁদ চোখে পড়ল, পরিষ্কার চাঁদ, প্রায় গোল; মানে কাছাকাছি পূর্ণিমা।

টাঙাটা নুড়ি পাথরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। চাকার শব্দ। ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ। টাঙার চারদিক থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও উঠছিল।

বরদা শালবন দেখতে লাগল। সামান্য তফাতে শালের বন। বনের মাথায় চাঁদ। বাতাসে যেন শালপাতার গন্ধ জড়িয়ে আছে।

খুশি হয়ে বরদা বলল, "জায়গাটা ওয়াণ্ডারফুল।...ওটা শালবন তো?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা দুলিয়ে হাসলেন, "হ্যাঁ, শাল। এদিকে শাল আর পলাশই বেশি। অন্য গাছও আছে।"

"আপনারা জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছেন।"

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বেছে নিয়েছি ঠিক নয়, এক বেহারী ভদ্রলোক—যমুনাপ্রসাদ—আমাদের জায়গাটা এক রকম দানই করে দেন। তাঁর অনেক জমিজায়গা ছিল—মানুষটিও ছিলেন ধর্মভীরু,

পরলোক সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা ছিল, অনেক-কিছু বিশ্বাস করতেন তিনি, আত্মাটাত্মা, প্রেতট্রেত...। নিজে একটু-আধটু চর্চাও করতেন।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল একবার, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শালবনের তলায় গড়িয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখতে লাগল। হালকা ঠাণ্ডাও লাগছিল।

অন্যমনস্কভাবেই বরদা বলল, "ভূতপ্রেত নিয়ে আবার কেউ চর্চা করে নাকি? আপনিই না বলেছিলেন, ওসব নিয়ে লোক ঠকানো কারবার চলে!"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমি তা বলিনি। বলেছি, কিছু লোক রয়েছে যারা এ-সব নিয়ে ব্যবসা করে, পয়সা কামায়। আবার কেউ-কেউ আছে যারা সত্যি-সত্যি এর চর্চা করে।"

"সত্যি-সত্যি চর্চা?" বরদা কৌতুকের গলায় বলল। তাকাল আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মানুষের নানা খেয়াল থাকে, কৌতূহল থাকে।"

"আপনারা তো ঠিক ভূতপ্রেত চর্চা করেন না?"

"না।"

"মহাদেব দাশ করে?"

"চর্চা করে না; ও কিছু ফন্দি আঁটছে। কিসের ফন্দি তা আমি এখনও ঠিক ধরতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের এখানে যারা আছে তাদের দু-একজনকে ও ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে লোক ঠকাবার ব্যবসা ফাঁদবে। পয়সা রোজগার করবে।"

বরদা টাঙার ঝাঁকুনিতে সামান্য গড়িয়ে গিয়েছিল, ভাল ভাবে বসল, বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু, সত্যি সত্যি কি মানুষে ভূতের চর্চা করে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন একটু, বললেন, "করে। আমাদের দেশের দু-একজনের নাম আমি শুনেছি। কাশীর কাছে এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, লোকে তাঁকে শুকলজী বলত। আমি তাঁকে দেখিনি। পঞ্চাশ-ষাট সাল আগেই তিনি মারা গেছেন। শুনেছি তিনি বিদেহী আত্মার চর্চা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর বইও ছিল।" সিদ্ধেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, "আরও একজনের কথা শুনেছি, পঞ্চানন সাহানা, বর্ধমান জেলার লোক। তাঁরও নামডাক ছিল, সেও ধরুন বছর ত্রিশ আগে। তিনিও মারা গেছেন।"

বরদা তাকিয়ে তাকিয়ে ছায়া দেখছিল শালবনের। চাঁদের আলো আর ছায়া যেন বনের গা দিয়ে টাঙার সঙ্গে সমানে ছুটছে। আবার কখনও কখনও বন যেখানে পাতলা, জ্যোৎস্না প্রায় পুকুরের জলের মতন পড়ে আছে। খাসা জ্যোৎস্নাও ফুটেছে আজ। যত রাত বাড়বে, আরও যেন ঝকঝক করে উঠবে চাঁদের আলো।

বরদা বলল, "এ-সব, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না। তবে এটা নতুন কিছু নয়। ভূতই বলুন আর প্রেতই বলুন, এর চর্চা সব দেশেই আছে। হেনরি করনেলিস অ্যাগরিপ্পা বলে কোনো নাম কখনো শুনেছেন?"

"না।"

"মাদাম ব্লাভেটস্কি?"

"না মশাই, শুনিনি। এঁরা কারা?"

"এঁরা বিখ্যাত অকালটিস্ট। হেনরি করনেলিস ফিফটিনথ্ সেঞ্চুরির লোক। তবে মাদাম ব্লাভেটস্কির নামটাই বেশি শোনা যায়। তিনি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির।"

বরদা চাঁদের আলো দেখার কথা ভুলে গেল। বলল, "অকালটিস্ট? মানে ভূতের—মানে ভূতের কী বলব—ভূতের বিশেষজ্ঞ?"

"না না, ভূতের নয়; বলতে পারেন ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা। তার মধ্যে প্রেতত্ত্বেও থাকতে পারে।"

বরদা চুপ করে গেল।

রাস্তাটা ছোট, উঁচু-নিচু, রাস্তার পাশে ফাঁকা-ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড়, দু-চারটে গাছ—আর-একটু তফাতেই টানা শাল-জঙ্গল। তবে জঙ্গলটা এখন যেন শেষ হয়ে এল। তেপান্তর মাঠ চোখে পড়ছে, মস্ত একটা টিলা, দু-চারটে কুঁড়েও যেন একপাশে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছিল।

বরদার হঠাৎ কেমন অসহায়-অসহায় লাগল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই নির্জন শাল-জঙ্গল, চাঁদের আলো। দু-একটা গোরুর গাড়ি আগে চোখে পড়লেও এখন আর মানুষজন, গাড়ি কিছুই চোখে পড়ছে না। এ-পথে কি মানুষ চলে না?

বরদার কেমন ভয়-ভয় লাগল। সে কি ভাল করল এসে? এখানে কি তার মন টিঁকবে? কে জানে সিদ্ধেশ্বরের রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে সে কী দেখবে? অস্বাভাবিক কিছু মানুষ, না হয় কিছু পাগল। বড়জোর দেখবে এক-একজন এক-একরকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখায়। কী লাভ হবে তাতে?

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি।"

"আর কতটা?"

"আধ মাইল মতন।"

"কোন দিকে?"

সিদ্ধেশ্বর টিলাটা দেখালেন, বললেন, "ওর পেছন দিকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, "সিদ্ধেশ্বরবাবু, আপনি

তো আমাকে নিয়ে এলেন, কিন্তু আমি যদি থাকতে না পারি?"

"কেন পারবেন না? পারবেন।"

"আমরা জলের মাছ, এই ডাঙায় কি ভাল লাগবে?" বলে বরদা হাসবার চেষ্টা করল। "মানিক থাকলে তবু হত।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। খাওয়া-দাওয়া-শোয়া—কোনো কষ্ট পাবেন না। আপনি আপনার মতন ঘুরে বেড়াবেন, আমাদের লোকজন দেখবেন। শুধু একটিমাত্র কাজ আপনি করবেন না, অন্তত আমাকে না জানিয়ে—।"

"কী কাজ?"

"মহাদেবের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। ওকে সব সময় এড়িয়ে যাবেন। যদি কখনো মনে হয় আমার, আমি আপনাকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বলে দেব। লোকটা ধুরন্ধর, ধূর্ত। ও আপনাকে দেখে কেমন চমকে যায়—আজই দেখবেন।"

বরদা বলল, "মহাদেবের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বেঘোরে আমি না মরি মশাই!"

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন। "মরার কথা তুললেন বলেই বলছি। আমি বেঁচে থাকতে আপনি মরবেন না। আপনি আমার বন্ধু, আশ্রিত। আমি আমার স্বার্থে আপনাকে এনেছি, কাজ শেষ হলে আমি নিজে আপনাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসব।"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

টাঙাটা যথারীতি ছুটছিল। অজস্র জোনাকি জ্বলছে একজোড়া গাছের তলায়। বুনো পাখি ডাকল কোথাও। ঠাণ্ডা লাগছিল বরদার।

আরও খানিকটা এগিয়ে এল টাঙা। সিদ্ধেশ্বর হাত তুলে দেখালেন। বললেন, "ওই দেখুন আমাদের জায়গা।"

তাকাল বরদা। খুব একটা কাছে নয় সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেণ্টার। স্পষ্ট করে কিছু চোখে না পড়লেও একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল জায়গাটার। মনে হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একতলা টানা কিছু বাড়িটাড়ি। ব্যারাক বাড়ির মতন দেখাচ্ছিল। টিমটিম আলোও চোখে পড়ছিল বরদার।

ধবধবে চাঁদের আলোয় একটা মফস্বলী হাসপাতাল কিংবা কোনো ছোট মিলিটারি ব্যারাক বাড়ি পড়ে থাকলে বোধহয় এই রকমই দেখায়।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বরদাবাবু, আপনার নামটা যদি কয়েক দিনের জন্যে পালটে নিতে চান তাও পারেন।"

বরদা বলল, "না, নাম আমি পালটাব না মশাই।"

হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। "না পালটালেন। মহাদেব দাশের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নাম দেওয়া যেত।"

"মহাদেবের বয়েস কত?"

"আপনার চেয়ে দু-এক বছরের বড়।"

"আমার সঙ্গে ওর চেহারার এমন মিল কেমন করে হল?"

"ও-রকম হয়। হামেশাই হয়। তবে খানিকটা অমিলও আছে।"

"কী?"

"মহাদেবের কান বড়; আপনার ছোট। মহাদেবের নাক আপনার চেয়েও বসা। তার কাঁধের দু পাশ উঁচু মতন। আরও আছে ছোটখাট; আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

টাঙাটা হঠাৎ ঝাঁকি মেরে উঠল। তার পরই দেখা গেল গাড়িটা প্রায় উলটে যাবার অবস্থা। ঘোড়াটা সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন।

টাঙাঅলা ঘোড়াকে বাগে আনল।

বরদা বলল, "আচ্ছা ঘোড়া তো! উলটে দিত মশাই।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে ফেললেন। "ঘোড়ারা ওরকম করে।"

বরদা সাবধানে বসল।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর বরদা বাড়িটা পুরোপুরি দেখতে পেল। ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। কাঠের ফটক। পাঁচিল ঘেঁষে কিছু গাছপালা। বাড়ির মাথায় টালির ছাদ। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে টালির ছাদে।

ফটকের কাছাকাছি টাঙাটা পৌঁছতেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। আপনার একটু অসুবিধে হবে।"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

ফটকের সামনে এসে টাঙা দাঁড়াল।

সিদ্ধেশ্বর টাঙা থেকে নেমে ফটক খুললেন। বললেন, "দাঁড়ান, আমি লোক ডাকি, সুটকেসগুলো নামিয়ে নেবে।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য এগিয়ে কাকে যেন ডাকছিলেন।

বরদা নেমে দাঁড়াল। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কোমর-টোমর ব্যথা করছিল।

আর খুবই আচমকা টাঙাটাকে ঘুরপাক খাইয়ে ঘোড়াটা আবার সামনের পা তুলে চেঁচাতে লাগল।

বরদা সরে এল একপাশে।

ঘোড়াটা কেন যে সামনের পা তুলে চেঁচাচ্ছে বরদা কিছু বোঝবার আগেই সিদ্ধেশ্বর যেন এক ছুটে ফিরে এলেন।

তারপর অবাক হয়ে বরদা দেখল সিদ্ধেশ্বর ঘোড়াটাকে বাগে আনবার জন্যে প্রায় যেন তার মুখের দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়েছেন।

টাঙাঅলাও ততক্ষণে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে।

সিদ্ধেশ্বরই শেষপর্যন্ত জিতলেন।

কিন্তু ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর খেয়ে তাঁর কপাল কেটে রক্ত পড়ছিল।

সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি বরদার। নতুন জায়গা, পরিবেশটাও বিচিত্র; অস্বস্তি এবং গা-ছমছমে ভাব নিয়ে কেমন করে মানুষ ঘুমোতে পারে! ভোর হয়ে আসছে, অন্ধকার ফিকে হয়ে সবে ফরসা ফুটে উঠতেই বরদা বিছানার ওপর উঠে বসল। রাত্রে যেন বরদার কোনো বল-ভরসা ছিল না, ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছিল, সকালে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, নিশ্চিন্ত হল।

বিছানায় কিছুক্ষণ বসে থাকল বরদা, যতক্ষণ না চোখে দেখার মতন পরিষ্কার হয়ে ওঠে সব। তার ঘরের জানলার অর্ধেকটা কাঠ, বাকিটা কাচ। পাল্লাগুলো কেমন তেড়াবাঁকা, ফাঁক হয়ে রয়েছে, হাওয়া আসে। বরদাকে একেবারে রাজার হালে না-রাখলেও আতিথ্য-কর্মে সিদ্ধেশ্বরের ত্রুটি ছিল না। লোহার খাট, তলায় নিশ্চয় স্প্রিং রয়েছে, বিছানায় শুলেই গা ডুবে যায়; গদি, তোশক, পরিষ্কার চাদর বালিশ—সবই বরদার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে, ছোট টেবিল। এর বেশি বরদা আর কী আশা করতে পারে!

চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসতেই বরদা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। জামাটা গায়ে দিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

একেবারে ব্যারাক-বাড়ির মতন দেখতে। গোটা দুই লম্বা-লম্বা টানা একতলা বিল্ডিং, পাশাপাশি নয়, একের গায়ে অন্যটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতন জুড়ে আছে, অন্য পাশে ছোট মতন একটা 'কটেজ'; পেছনের দিকে বোধ হয় রান্নাবান্নার ঘর। ব্যারাক-বাড়ির কোনোটার মাথায় টালি, কোনোটার মাথায় খাপরা—মানে যাকে খোলার চাল বলে। মন্দ দেখায় না বাড়িগুলো। সত্যিই দেহাতি হাসপাতালের মতন দেখায়, কিংবা আশ্রম-টাশ্রম মনে হয়।

বরদা যেন নতুন কিছু দেখছে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল পায়চারির ভঙ্গিতে। সকালের বাতাস তার ভাল লাগছিল। কেমন এক সুন্দর গন্ধ রয়েছে, ধুলো বালি ধোঁয়া নেই বাতাসে এক ফোঁটাও। নিশ্বাস নিতেও কী যে আরাম লাগে!

পি পি রিসার্চ সেণ্টারের অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়, তবু মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে কম্পাউণ্ড ওআল। মধ্যিখানে আশেপাশে টুকরো-

টুকরো বাগান। লতাপাতা ফুল চোখে পড়ে। দু-চারটে বড়-বড় গাছও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, শাল নিম হরীতকী।

একেবারে পুরোপুরি সাদা হয়ে গেল চারপাশ। সূর্য উঠছে।

এতক্ষণ বরদা কোনো সাড়াশব্দ পায়নি; মানুষজনও দেখেনি। এবার গলা পেল।

সিদ্ধেশ্বরের কথা আবার মনে পড়ল বরদার। ভদ্রলোক কাল জোর চোট পেয়েছেন কপালে। ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। পরে ওষুধ দিয়ে লিউকোপ্লাস্ট এঁটে দিয়েছিলেন। কেমন আছেন সিদ্ধেশ্বর? জ্বরজ্বালা হয়েছে নাকি? তবে সত্যিই তিনি অদ্ভুত মানুষ, ওই টাঙার ঘোড়ার সঙ্গে সমানে যুঝে গেলেন, হার মানলেন না। ঘোড়াটাকেই বাগে আনলেন।

টাঙাঅলা কাল আর ফিরে যায়নি। ফিরে যাবার হয়ত কথাও ছিল না। এতটা পথ একা-একা রাত্রে ফিরে যাবেই বা কী করে! ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক। টাঙাঅলা ভয় পেয়ে গিয়েছিল! আর ঘোড়াটাই বা অমন কেন করল কে জানে।

বরদা কেমন কৌতূহল বোধ করে টাঙা আর ঘোড়াটাকে খুঁজতে লাগল।

পি পি রিসার্চ সেন্টারের লোকজন এইবার সব একে-একে জেগে উঠছে। বাইরে আসছে। মুখটুখ ধুতেও যাচ্ছিল। বরদার দিকে কারও চোখ পড়ছে, কারও বা পড়ছে না। তাকাচ্ছে, দেখছে।

হঠাৎ বরদা কার যেন গলা শুনতে পেল। তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। সেই মহাদেব।

মহাদেবকে কাল দেখেনি বরদা। আজ সকালে দেখল।

মহাদেব তফাত থেকে লক্ষ করছিল বরদাকে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

বরদা ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হলেও কোনো অস্থিরতা দেখাল না। সিদ্ধেশ্বরের কথা মনে পড়ল, তাঁর উপদেশ। লোকটাকে পাত্তা দিলে চলবে না। অগ্রাহ্য করতে হবে।

মহাদেব কাছে এসে বলল, "নমস্কার"। বলে দু হাত জোড় করে যেন ঠাট্টার ছলেই নমস্কার জানাল বরদাকে।

বরদা দায়সারা গোছের নমস্কার জানাল।

"আপনিই তো কাল এলেন?" মহাদেব বলল।

ঘাড় নাড়ল বরদা।

"আপনার নাম?"

"বরদা মজুমদার।"

"কোথা থেকে আসছেন?"

"কলকাতা থেকে।"

"আমার নাম মহাদেব দাশ।"

বরদা কোনো জবাব দিল না, সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পাশে-পাশে মহাদেবও হাঁটছিল। "এমন আশ্চর্য ঘটনা কেমন করে ঘটল, মশাই। আমরা যেন যমজ!"

বরদা নিজেকে সামালাচ্ছিল। সে যেন বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি, গ্রাহ্যও করেনি, বলল, "কে বলল যমজ?"

"বলেন কী, চেহারার এমন মিল...!"

"শয়ে-শয়ে পাওয়া যায়। আপনি এখানে থাকেন, নিজেকে ছাড়া দেখতে পান না। কলকাতায় যান—আরও পাঁচ-সাতটা মহাদেব পেয়ে যাবেন। দিল্লি যান, কম করেও দুটো।" বলেই কী মনে হল বরদার, মহাদেবকে জব্দ করার জন্যে বলল, "আমার ছোট ভাই, বছর দেড়েকের ছোট, অবিকল আমার মতন দেখতে। বাড়িতেই লোকে ভুল করে বসে। আপনার সঙ্গে আমার আর কতটুকু মিল?"

মহাদেব কথা বলতে পারল না। বোধ হয় বরদার সঙ্গে তার মিল-অমিল খুঁটিয়ে দেখছিল।

খানিকটা পরে বলল, "আপনি কী করেন?"

বরদা বলতে যাচ্ছিল, কিছুই করা হয় না; হঠাৎ তার মনে হল, একটু চালাকি করা ভাল। মহাদেবকে তার ঠিকুজি কোষ্ঠী জানানোর তো প্রয়োজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল, যেন মহাদেবের কথা শুনতে পায়নি। সূর্য উঠে গেছে। আকাশ থেকে রোদ নামছে ধীরে-ধীরে। বাঃ, চমৎকার।

মহাদেব পিছু ছাড়ল না। পাশেপাশেই হাঁটছিল।

"সিধুবাবুর বন্ধু আপনি?" মহাদেব আবার বলল।

বরদা বিরক্ত বোধ করলেও কিছু বলল না, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। "শত্রুও হতে পারি।"

"শত্রু?"

"কেন, শত্রু হতে পারা যায় না?" বলে নিজের বিরক্তি স্পষ্ট করেই জানিয়ে ফেলল, রুক্ষভাবে তাকাল মহাদেবের দিকে, তারপর হনহন করে এগিয়ে গেল।

মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামান্য এগিয়ে হাঁফ ফেলল বরদা। আচ্ছা এক লোকের পাল্লায় পড়েছিল; আঠার মতন আটকে থাকে লোকটা। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, মহাদেব অতি চতুর এবং বুদ্ধিমান। বরদার মতন মানুষকে এক হাটে বেচে

অন্য হাটে কিনতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই, বরদার ওপর সে নজর রেখেছে।

আরও একটু এগিয়ে আসতেই টাঙাটা দেখা গেল। ঘোড়া আরও খানিকটা তফাতে। বাঁধা রয়েছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরকেও দেখতে পেল বরদা। দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বরদা বলল, "কেমন আছেন?"

সিদ্ধেশ্বরের কপালে লিউকোপ্লাস্ট। দু-চারটে আঁচড়ের দাগ নীল হয়ে আছে চোখের পাশে। বাঁ দিকের চোখের কাছটায় ফোলা। মুখটাও শুকনো।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ব্যথা রয়েছে। রাত্রে জ্বর এসেছিল।"

"এখনও জ্বর আছে?"

"না বোধ হয়। দু-একদিন ভোগাবে। ওষুধপত্র লাগিয়েছি, সেরে যাবে।"

"আপনি ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কেন? ও হল পশু!"

সিদ্ধেশ্বর একটু যেন হাসলেন। "ঘোড়ার চেয়েও বড় পশু এখানে আছে।"

বরদা বুঝল না। বলল, "আপনাদের মহাদেবের সঙ্গে এইমাত্র পরিচয় হল।"

"দেখলাম।"

"ও মশাই ঘুঘু লোক। ঠিক নজর রেখেছিল। সকালেই ধরেছে।"

"কী জিজ্ঞেস করছিল?"

"ও তো আমায় জেরা করছিল," বরদা বলল। মহাদেবের সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে বলল সব।

"আমার কী মনে হয় জানেন সিদ্ধেশ্বরবাবু?" বরদা বলল, "আমার একটা ছদ্ম-পরিচয় তৈরি করে রাখা উচিত ছিল। নয়ত লোকটাকে আমি সামলাতে পারব না।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললেন, "আপনি তো নামটাও পালটাতে চাইলেন না?"

"চাইনি। তখন বুঝিনি ব্যাপারটা। এখন অন্যগুলো পালটাতে চাই।"

সিদ্ধেশ্বর ভাবছিলেন। বললেন, "হবে। আমি আপনাকে বলে দেব।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি মুখটুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। প্রথমে আপনাকে আমাদের এই সেন্টারের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তারপর একবার সব ঘুরিয়ে দেখাব।"

"উনি কোথায় থাকেন, আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা?"

সিদ্ধেশ্বর পুবের দিকে হাত বাড়িয়ে সেই ছোট 'কটেজ'-টা দেখাল।

"কী নাম ওঁর?"

"যামিনীভূষণ মৈত্র।"

বরদা পুবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য বেলায় বরদা গেল যামিনীভূষণকে দেখতে। সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর।

ঢাকা বারান্দায় আর্ম চেয়ারে বসে ছিলেন যামিনীভূষণ। বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। সত্তরের ওপারে পৌঁছে কেমন নির্জীব হয়ে পড়েছেন। মানুষটিকে এখন দেখলে কেমন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী মনে হয়। মাথায় একটি-দুটির বেশি চুল নেই, নেড়া। পরনে গেরুয়া কাপড়, পাট করা। গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর একটা চাদর ছিল। পায়ে পাতলা চটি, রাবারের। চোখে ভাল দেখতে পান না। গোল কাচের মামুলি চশমা চোখে। কোনো রকম শখ নেই, শৌখিনতা নেই, একেবারে সাদামাটা মানুষ।

বরদার কেমন ভক্তিই হল।

সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন নিশ্চয়। যামিনীভূষণ বরদাকে দেখলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সাধারণ কথাবার্তাই বললেন। বরদার ঘরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকে বরদা—কে কে আছে বাড়িতে, এই জায়গাটা কেমন লাগছে ইত্যাদি।

বরদা কথা বলতে-বলতে চারপাশ দেখছিল। যামিনীভূষণের অন্তত একটা শখ চোখে পড়ছিল বরদার। বারান্দার চারদিকেই ফুলের টব সাজানো। গাছপালা ভালবাসেন উনি। বাড়ির নীচেও ছোট বাগান। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই কোথাও।

বারান্দার ডান দিকে বোধ হয় যামিনীভূষণের অফিসঘর। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছিল না বারান্দা থেকে, শুধু টেবিল চেয়ার, বইয়ের এক-আধটা আলমারি চোখে পড়ছিল।

সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে দু-চারটে কথা সেরে যামিনীভূষণ বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমি এখানে এসেছ যখন তখন তোমার সুখ-সুবিধে ভালমন্দ দেখা আমাদের কাজ। কোনো অসুবিধে হলে সিদ্ধেশ্বরকে বোলো।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "এখানে নানা রকম লোক থাকে, তাদের যেমন গুণও আছে, কিছু কিছু আবার অগুণও রয়েছে অনেকের। সব সময় একটু চোখ খুলে রেখো। নিজে ভাল করে চোখে কিছু না দেখে কোনো জিনিসই বিশ্বাস কোরো না। বরং অবিশ্বাস ভাল, তবু না-জেনেশুনে দেখে বিশ্বাস করে নেওয়া ভাল নয়।"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় উঠতে বললেন বরদাকে। বরদা উঠে পড়ল।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মাঠময় রোদ। টাঙাওলা তার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। ঘোড়াটাও নেই। লোকজন যে যার মতন ঘোরাফেরা করছিল। রান্নাঘরের দিকে ধোঁয়া উঠছে। কুয়োতলায় জলটল তোলা হচ্ছে, চাকার শব্দ আসছিল।

বরদার বেশ লাগল শব্দটা শুনতে। দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল কুয়োর

দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের জলের ব্যবস্থাটা পাকা করতে পারছি না। অনেক অসুবিধে। দুটো কুয়ো। একটায় হুইল দিয়ে জল তোলা হয়; আর-একটায় রয়েছে লাটা-খাম্বা।" বলে আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের দিকে আরও একটা কুয়ো দেখালেন।

বরদা বলল, "পাম্প বসিয়ে নিন। ও, আপনাদের তো আবার ইলেকট্রিসিটি নেই।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আশাও নেই। তবে ডিজেল পাম্প দিয়ে বোধ হয় কাজটা সারা যায়।"

বরদা যদিও কিছু জানে না, বলল, "তা যায়।"

দু জনেই হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে-হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনি বরদাবাবু, একটা পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান না?"

"মানে?" বরদা কিছু বুঝল না, অবাক চোখে তাকাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধোঁকা দেবার জন্যে একটা কিছু বলা দরকার। আপনি যদি পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান, তা হলে আপত্তি কিসের?"

মাথা নাড়ল বরদা। "পাগল নাকি আপনি মশাই, আমি কোনো পাম্প কোম্পানির নামই জানি না। ওসব আমার মাথায় আসে না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মাথায় আসবার আছে কী! আমি কলকাতায় গিয়ে কোনো পাম্প কোম্পানিতে দেখা করতে পারি। পারি কিনা বলুন? তাদের লোক নিয়ে আসতে পারি এখানে। আপনিই সেই লোক। আপনার কোম্পানি আপনাকে পাঠিয়েছে কেমন পাম্প লাগবে, কোথায় বসানো হবে, জলের পাইপ কেমন করে বসালে সুবিধে হবে—এইসব তদারকি করে আসতে।"

বরদা হাত নাড়ল জোরে জোরে। "পারব না মশাই। আমি ধরা পড়ে যাব। পাম্প-এর 'প' পর্যন্ত আমি জানি না।"

"আপনি কি ভাবছেন মহাদেবই জানে?" সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ওর অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার বুদ্ধি হবে না। আর আপনিই বা ওর সঙ্গে এসব কথা বলবেন কেন! এখানে কী হবে না-হবে তা ঠিক করার মালিক যামিনীবাবু আর আমি।"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার অফিসে অনেক রকম কাগজপত্র পড়ে আছে। পাম্পের কথা আমি লিখেছিলাম কলকাতায় একবার। বোধ হয়, চিঠির জবাব, ক্যাটালগ, আরও কী কী পড়ে আছে ফাইলে।"

"আমরা কি এবার আপনার অফিসে যাব?"

"হ্যাঁ, চলুন। অফিসে আমাদের খাতা আছে। খাতায় এখানে যারা রয়েছে তাদের নাম-ধাম, কে কবে এসেছে, কার কী বৈশিষ্ট্য সব লেখা আছে। একবার সেটা শুনে নেওয়া ভাল।"

সিদ্ধেশ্বর যেখানে থাকেন, তার পাশেই অফিসঘর।

ঘর ছোট, আসবাবপত্রও কম, তবু লোহার আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, কাচের আলমারিতে সাজানো কিছু ফাইল, বইপত্র, আরও টুকিটাকি জিনিস রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর লোহার আলমারি খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করলেন।

বরদা একটা সিগারেট ধরাল। তার ডান দিকে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে নিমগাছ চোখে পড়ছে। এক ঝাঁক চড়ুই আর শালিখ মাঠে নেমেছে। কাক ডাকছিল কোথাও।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে এখন এগারোজন রয়েছে, যারা দেখার মতন। কাজটাজ যারা করে তাদের কথা ধরছি না।" বলে সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা ওলটালেন। এই এগারোজনের মধ্যে পাঁচজনকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি। বাকি ছ'জন তুলনায় খানিকটা সাধারণ।"

"মহাদেবকে বাদ দিয়ে বলছেন?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "যে পাঁচজনের কথা আমি বলছি—তাদের আমি পরে দেখাব। আগে শুধু তাদের পরিচয় শুনুন।"

বরদা কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, খাতায় চোখ রেখে, "প্রথম সীতারাম পাল। বয়স আটচল্লিশ। আদরার কাছে এক গ্রামে থাকত। ছেলেবেলায় এর কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েসের সময় একবার আদরা প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে ছিটকে মাঠে পড়ে যায়। মাথায় চোট লেগেছিল, পা ভেঙে গিয়েছিল। ওই অ্যাকসিডেণ্টের পর সীতারাম শুধু বেঁচেই গেল না, ওর মধ্যে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দিল। সীতারামের ডান হাতের কোথাও যদি কেটে চিরে দেওয়া যায়, তাহলে যেখান থেকে রক্ত পড়বে—বাঁ হাতেরও ঠিক সেই জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আসবে। এক হাতের যেখানে কালসিটে পড়ুক অন্য হাতেরও ঠিক সেই জায়গায় কালসিটে ফুটে উঠবে। যে-কোনো আঘাত, দুই অঙ্গে প্রায় সমানভাবে ফুটে ওঠে কেন? কী কারণে? আমরা এর কোনো সদুত্তর জানি না। সীতারাম এখানে বছর চারেক আছে। প্রথম থেকেই।"

বরদা শুনছিল। এই অদ্ভুত মানুষটির কথা সিদ্ধেশ্বর আগেও বলেছেন যেন।

"সীতারামের পর হল গোপীমোহন মণ্ডল। গোপীমোহনের বয়েস

বছর চল্লিশ," সিদ্ধেশ্বর বললেন। "গোপীমোহনকে আমরা পেয়েছি এক মেলায়। খেলা দেখাত গোপীমোহন। বরফের চাঁইয়ের ওপর শুয়ে থাকত; তার মুখের ওপর চাপানো থাকত সের খানেক বরফ। গোপীমোহনকে পনেরো-বিশ মিনিট পরে উঠিয়ে নিয়ে দেখা গিয়েছে, তার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম হয়ে গিয়েছে নিজের থেকেই। এটা কেমন করে হয়?"

বরদার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। যত অদ্ভুত, বিদঘুটে যা কিছু সবই কি সিদ্ধেশ্বররা এই পি পি রিসার্চ সেণ্টারে জড় করে রেখেছেন? এটা নিশ্চয় কোনো পাগলাদের আড্ডা।

সিদ্ধেশ্বর খাতা উলটে তৃতীয়জনের নাম বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে যেন চেঁচামেচি শোনা গেল। আর তার পরই একজন ঘরে এল ঝড়ের ঝাপটার মতন। হাঁফাচ্ছিল। চোখমুখের চেহারা অস্বাভাবিক। লোকটা বলল, "বাবু, টাঙাঅলা আধ মাইলটাক দূরে মাঠে পড়ে আছে। টাঙাটা নেই। টাঙাঅলা বোধ হয় মারা গেছে।"

বরদা চমকে উঠল। বুকের কোথায় যেন এক ভয় ছিল লুকিয়ে, সেই ভয় সমস্ত বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, গলা বন্ধ হয়ে এল বরদার।

সিদ্ধেশ্বর খাতাটা টেবিলে ফেলে রেখেই উঠে পড়লেন।

বরদা চোখের পলক ফেলার আগেই সিদ্ধেশ্বর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ পাওয়া গেল না।

বরদার ভাল লাগছিল না। সকালের দিকে তার মন-মেজাজ মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু টাঙাঅলার খবরটা শোনার পর থেকেই বরদা কেমন মনমরা হয়ে গেল। বরদা এখানে একা। জায়গাটাও তার চেনা নয়। আর পি পি রিসার্চ সেণ্টার তো একটা পাগল-টাগলদের আড্ডাখানা। এই রকম একটা জায়গায় বরদার একমাত্র ভরসা সিদ্ধেশ্বর। তিনিও নেই। টাঙাঅলার যে কী হল, সে মরল না বাঁচল, কাকে জিজ্ঞেস করবে বরদা? জনা দুই লোক—এখানে যারা কাজকর্ম করে—তারাও সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে চলে গেছে। বাদবাকি যারা, তারা কোনো খবর রাখছে বলেও মনে হল না বরদার।

কেমন একটা উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মধ্যে দুপুরটা কাটল। এমনিতে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না, স্নান-খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুর নয়, কিন্তু

বরদাকে যে-লোকটা দেখাশোনা করছিল সে টাঙাঅলা কিংবা সিদ্ধেশ্বরের খবর কিছুই দিতে পারল না।

বরদার মাথায় নানারকম চিন্তা আসছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, যে টাঙাগাড়ি করে কাল তারা এতটা পথ এল, সেই টাঙার ঘোড়াটা হঠাৎ এই জায়গাটার কাছাকাছি এসে ওরকম লাফঝাঁপ শুরু করল কেন? ঘোড়াটা নিশ্চয় বুনো নয়, খেপা নয়। যদি খেপা ঘোড়া হত, টাঙাঅলা কি তাকে গাড়িতে জুড়ে নিত? অসম্ভব। সিদ্ধেশ্বর কাল বলেছিলেন, সব ঘোড়াই নাকি মাঝে-মাঝে পা ছোঁড়ে, চেঁচায়, লাফিয়ে ওঠে। যদি তাই হয়, তবে আজ আবার সেই ঘোড়াটাই টাঙাঅলাকে মাঝমাঠে ফেলে দিয়ে পালাবে কেন?

কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না বরদা। ব্যাপারটা তার কাছে সহজ বা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না।

দুপুরে শুয়ে-শুয়ে বরদার রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কলকাতা ছেড়ে এইভাবে চলে আসা তার উচিত হয়নি। মানিক বারণও করেছিল। বরদা ঝোঁকের মাথায় চলে এল—সিদ্ধেশ্বরকে ভরসা করে। সিদ্ধেশ্বরকে কতটুকু চেনে বরদা? মুখের কথায় বিশ্বাস করেছে সে। কে বলতে পারে, সিদ্ধেশ্বর মুখে যা বলেছেন, কাজে তার উলটো করবেন না? মানুষকে কি এত সহজে বিশ্বাস করা ঠিক হয়েছে!

দুপুর ফুরিয়ে বিকেল হল। বরদা বাইরে এসে দাঁড়াল একবার। এখনও রোদ রয়েছে গাছের মাথায়, আকাশ পরিষ্কার, জঙ্গলের বাতাস আসছিল, মাটির গন্ধও নাকে আসে। কিন্তু পুরো জায়গাটাই কেমন চুপচাপ। দু-চারজনকে চোখে পড়লেও যে যার নিজের মতন কাজকর্ম করে যাচ্ছে। মনেই হয় না, টাঙাঅলাকে নিয়ে কারও কোনো দুশ্চিন্তা রয়েছে।

বরদা ঠিক করল, সে এখানে থাকবে না। কালই চলে যাবে। সিদ্ধেশ্বরকে বলবে, "আমায় ছেড়ে দিন মশাই, আমি আপনাদের এসবের মধ্যে নেই, আমার ভাল লাগছে না।"

বিরক্ত হয়েই বরদা তার ঘরের সামনে পায়চারি করছিল, বিকেলও ফুরিয়ে এল, এমন সময় সিদ্ধেশ্বরকে দেখা গেল; তিনি ফিরলেন।

বরদা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিদ্ধেশ্বরের কাছে গেল।

কাছে গিয়েই থমকে গেল। মানুষটিকে যেন আর চেনা যায় না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেমন চেহারা হয়ে গেছে সিদ্ধেশ্বরের। ধুলোয় ভরা বেশবাস। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো; সমস্ত মুখ কালচে, শুকনো। ভীষণ ক্লান্ত, হতাশ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে। একটা চোখ আরও ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে।

বরদা টাঙাঅলার কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর

বললেন, "পরে বলব। সন্ধেবেলায়। আপনার ঘরে আসব।"

কোনো কথা বলার সুযোগ হল না বরদার; সিদ্ধেশ্বর ক্লান্ত পায়ে চলে গেলেন। বরদার মনে হল, টাঙাঅলা আর বেঁচে নেই।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল বরদার। আহা, বেচারা টাঙাঅলা!

সন্ধেবেলায় ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল।

বরদা বিছানায় বসে। সিদ্ধেশ্বর ঘরে এলেন।

হাত মুখ ধুয়ে-মুছে, জামা-টামা পালটে সামান্য ভালই দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে, অন্তত বিকেলের সেই ঝোড়ো চেহারা আর তেমন প্রকটভাবে চোখে পড়ছিল না।

বরদা বলল, "আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

সিদ্ধেশ্বর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বরদার কাছাকাছি বসলেন।

বরদা বলল, "টাঙাঅলা বেঁচে আছে?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর ধীরে-ধীরে। "না।"

বরদা যেন জানত কথাটা। চমকাল না। কিন্তু মুখ কালো হয়ে গেল।

চুপচাপ। বরদা কয়েক পলক সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ সরাল। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল তার। সিদ্ধেশ্বরও কেমন বিষণ্ণ মুখ করে বসে থাকলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনার কাছে সিগারেট আছে? দিন তো একটা, খাই।"

বরদার সিগারেট কমে এসেছিল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

সিদ্ধেশ্বর একটা সিগারেট নিয়ে দেশলাই চাইলেন।

বরদা এই ক'দিনের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরকে সিগারেট খেতে দেখেনি। এই প্রথম। হয়ত মানসিক অস্থিরতার জন্যে সিদ্ধেশ্বর সিগারেট খেতে চাইছেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি ছিলাম না, আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

"না।"

"সময়মতন খাবার দিয়ে গিয়েছিল?"

"দিয়েছিল।"

"বিকেলে চা-জলখাবার পেয়েছেন?"

"চা খেয়েছি। জলখাবার খাইনি। ইচ্ছে করছিল না।"

"আর একবার দেবে। চা আনতে বলে এসেছি।"

বরদা অধৈর্য হয়ে বলল, "টাঙাঅলার কথা বলুন।"

সিদ্ধেশ্বর যেন চোখ সরিয়ে নিলেন। "কী বলব?"

"টাঙাঅলা কি মাঠেই মরে পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"টাঙাটা ছিল?"

"কাছে ছিল না। দূরে ছিল। উলটে পড়ে ছিল, কাত হয়ে।"

"ঘোড়াটা?"

"জানি না।"

বরদা বেশ বুঝতে পারল, তার বুকের মধ্যে কেমন ধকধক করছে। উত্তেজনা, না ভয়?

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি টাঙাঅলাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন?"

মাথা হেলালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমি জানতাম ও মারা গেছে। তবু নানা রকম চেষ্টা করে দূরের একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, "টাঙা থেকে পড়ে কেউ ওভাবে মরে না।"

বুঝল না বরদা। "মানে?"

"মানে, কেউ টাঙা থেকে পড়ে গেলে ওভাবে মরে বলে আমার মনে হল না!"

"কী মনে হল আপনার?"

সিদ্ধেশ্বর আলগা করে সিগারেটে টান দিলেন, অন্যমনস্ক। বললেন, "আমার মনে হল কেউ যেন ওর ঘাড় ভেঙে দিয়েছে—যাকে আমরা মটকানো বলি। মাথার চেয়ে ঘাড়ই বেশি জখম। শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "টাঙা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে যেতে পারে না? নাকি শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে না?"

"পারে হয়ত। কিন্তু আমি যা চোখে দেখেছি, তাতে আমার মনে হল, আসুরিক কোনো শক্তি যেন তার ঘাড় ভেঙে মাথা মুখ প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ফেলেছে।"

বরদা চোখ বন্ধ করে ফেলল প্রায়। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মাঠে টাঙাঅলাকে দেখতে যাবার একটা ইচ্ছে সকালে তার একবার হয়েছিল। ভাগ্যিস যায়নি! সিদ্ধেশ্বর যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তবে সেই দৃশ্য বরদা দেখতে পারত না চোখে। মানুষের মুখ যদি উলটে ঘাড়ের দিকে চলে যায়—কী বীভৎস না দেখতে লাগে!

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "অথচ, দিনের বেলায় ফাঁকা মাঠে কে আর আসবে ওকে মারতে?"

"আপনি—" বরদা বলল, "আপনি মারার কথা কেন বলছেন?"

"জানি না। মনে হচ্ছে।"

"হাসপাতালে কিছু বলল না?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনারা কলকাতার লোক, যা হয় সবই কলকাতার চোখ নিয়ে দেখেন। এখানে অত ব্যবস্থা নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট একটা হাসপাতাল। জ্বর-জ্বালার মিক্সচার দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তবু নেহাত দায়ে পড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। মরা মানুষকে হাসপাতালে দিয়ে কী আর লাভ হবে বলুন!" সিদ্ধেশ্বর বললেন ক্ষোভের গলায়।

বরদা কথা বলল না। সিদ্ধেশ্বর হয়ত ঠিকই বলেছেন, এই দেহাতের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কলকাতা হলে অন্য কথা ছিল।

"ওর লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল সকালে পোড়াতে নিয়ে যাবে।"

"হাসপাতালেই রেখে এসেছেন ডেড্ বডি?"

"হ্যাঁ।"

"তবু ডাক্তার কিছু বলল না দেখে শুনে?"

"না। টাঙা থেকে পড়ে মাথায়, ঘাড়ে-পিঠে চোট খেয়েছে শুনে খাতায় বোধহয় লিখে নিল।"

"তার মানে অ্যাকসিডেণ্টাল ডেথ্?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "হ্যাঁ।"

দরজায় শব্দ হল।

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। দরজা খুলে দিলেন।

চা নিয়ে এসেছিল একজন। চা দিয়ে চলে গেল।

দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। চা খেতে-খেতে বললেন, "আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

চোখ তুলে তাকাল বরদা। "আমারও কেমন লাগছে! কাল আমরা যখন আসছিলাম, টাঙার ঘোড়াটা কোনো গোলমাল করেনি। হঠাৎ এখানে এসে ওরকম খেপার মতন লাফাতে লাগল কেন?"

সিদ্ধেশ্বর নীরব থাকলেন।

অপেক্ষা করে বরদা বললে, "আজ সকালে আমি ঘোড়াটাকে দেখেছি। গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আজ তো সে শান্তই ছিল। অবশ্য, আমি দূর থেকে দেখেছি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ঘোড়াটা গাড়িতে জুতে নেবার সময় টাঙাঅলা নিশ্চয় দেখেছিল। তার যদি মনে হত, ঘোড়া বেচাল রয়েছে, গাড়িতে জুতে নিত না।"

"তা হলে?"

সিদ্ধেশ্বর অন্যমনস্ক গম্ভীর মুখে বললেন, "তাই ভাবছি।"

বরদা চা খেতে-খেতে বলল, "আপনাদের এখানে নানারকম অদ্ভুত মানুষ থাকে। তারা অবাক-অবাক কাণ্ড করতে পারে। আপনিই বলেছেন। এদের মধ্যে এমন কি কেউ রয়েছে, যে এইসব করতে পারে? মানে এমন কেউ কি আছে যার শয়তানি করার অশেষ ক্ষমতা?"

সিদ্ধেশ্বর কয়েক পলক দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চুপচাপ। চা খেলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "ছিল। এখন নেই।"

"মানে?" বরদা কেমন চমকে উঠল। "মহাদেব ছাড়া আরও শয়তান ছিল?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "এই কাজটা মহাদেবের নিজের হাতে করার নয়। তার এরকম কোনো ক্ষমতা নেই। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।"

"কে?"

"আপনি তাকে দেখেননি। সুজন মালাকার।"

বরদার কানে নামটা নতুন শোনাল। সকালে সিদ্ধেশ্বর খাতা খুলে যাদের নামধাম পরিচয়ের কথা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে সুজন মালাকার ছিল না। থাকার কথাও নয়। কেননা সিদ্ধেশ্বর জনা দুয়েকের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন মাত্র; বাকীদের পারেননি। টাঙাঅলার খবর শুনে খাতা ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। "তা ছাড়া সুজন তো এখন নেই", বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, "সুজন মালাকার! নাম যার সুজন সে এত—"

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সুজন নিজে যে শয়তান ছিল তা নয়। কিন্তু তার এমন কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা মানুষের অনেক সময় ক্ষতি করতে পারে। কেউ যদি সুজনকে কাজে লাগাতে চায়, লাগাতে পারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজনকে কেউ কাজে লাগিয়েছে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "মহাদেব কি সুজনকে হাত করেছে?"

"করতে পারে।"

"আপনি কি তাকেই সন্দেহ করছেন?"

"অন্য কারুর কথা মনে পড়ছে না। টাঙাঅলা যে-ভাবে মারা গেছে তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজন ওই টাঙায় উঠেছিল। কোথা থেকে উঠেছিল আমি জানি না। তাকে কেউ দেখেনি। সুজনকে এমনিতে দেখলে মনেই হবে না, তার আসুরিক কোনো শারীরিক শক্তি আছে। কিন্তু এক-এক সময় তার বেঁটেখাটো রোগাটে চেহারায় আসুরিক এক শক্তি এসে হাজির হয়। সে-শক্তি আমরা কল্পনা করতে পারব না।"

"কিন্তু টাঙাঅলার সঙ্গে তার শত্রুতা কিসের?"

"কোনো শত্রুতাই থাকার কথা নয়।"

"তবে?"

"বুঝতে পারছি না।"

বরদা সামান্য চুপচাপ থেকে শেষে বলল, "সুজন এখন কোথায় থাকে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখানে কিছুদিন ছিল। মাস কয়েক। তাকে এখানে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা তাকে আর রাখতে চাইলাম না। এমনিতে তো ভালই, সাদামাটা, কিন্তু এক এক সময় তাকে কোনো শয়তান যেন ভর করত। তখন তাকে সামলাবার সাধ্য আমাদের ছিল না। ও ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তখন আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই।"

"সেই রাগেই কি—"

"না না। তা মনে হয় না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সুজন এদিকে আর নেই। আজ আমার মনে হচ্ছে, সুজন কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।"

বরদা জিজ্ঞেস করল, "সুজনকে আপনারা কতদিন আগে তাড়িয়ে দিয়েছেন?"

"মাসখানেক আগে।"

বরদা কী ভেবে বলল, "মহাদেব তাহলে সুজনকে চেনে?"

"চেনে। ভাল করেই।"

"তাহলে কি মহাদেবের কোনো হাত আছে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অসম্ভব নয়।"

বরদা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সিদ্ধেশ্বর উঠে পড়লেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবেন। কাল সকালে কথা হবে।"

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন।

পরের দিন খানিকটা বেলায় সিদ্ধেশ্বরের লোক এসে বরদাকে ডেকে নিয়ে গেল অফিস-ঘরে।

সিদ্ধেশ্বর অফিসেই ছিলেন। গতকালের ধকল সামলে উঠতে পারেননি। চোখমুখ বসে রয়েছে, রুক্ষ-রুক্ষ চেহারা।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বসুন। রাত্রে কোনো অসুবিধে হয়নি তো!"

বরদা বলল, "না। আপনি কেমন আছেন? কপালের ঘা?"

"ব্যথা কমছে।"

আরও কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল টাঙা-অলার ব্যাপারটার জন্যে সারাটা দিন বাইরেই কাটাতে হল। কোনো কাজ হল না। আজ আপনাকে নিয়ে আমাদের এই জায়গাটায় একটু ঘুরব। কাল আপনাকে কার-কার কথা বলেছি যেন?"

বরদা বলল, "দুজনের কথা বলেছেন।"

"ও হ্যাঁ; মনে পড়েছে। সীতারাম আর গোপীমোহনের কথা বলেছি।" বলে সিদ্ধেশ্বর গতকালের সেই খাতাটা টেনে নিলেন।

বরদার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর আগে থেকেই খাতা সাজিয়ে নিয়ে বসে ছিলেন।

খাতার ওপর হাত রেখে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সীতারাম আর গোপী-মোহনের কথা আপনার মনে আছে তো?"

ঘাড় হেলাল বরদা। তার মনে আছে। সীতারামের শরীরের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তার ডান কিংবা বাঁ অঙ্গ যেন এক; ডান হাতের কোথাও কেটে গেলে বাঁ হাতেরও মোটামুটি সেই একই রকম জায়গা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে। আশ্চর্য! আর গোপীমোহন—যে লোকটা নাকি মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত তার এমনই এক ক্ষমতা যে, বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ পনের মিনিট শুইয়ে রেখে তারপর উঠিয়ে নিলে লোকটার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দুজনের কাউকেই স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ফেলা যায় না। এদের যে এ-রকম কোনো ক্ষমতা আছে তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বরদা আপাতত বিশ্বাস করে নিচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর এইসব অবিশ্বাস্য আজগুবি ব্যাপার দেখাবার জন্যেই তো তাকে টেনে এনেছেন।

সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা আর ওলটালেন না, বললেন, "আমি মুখেই বলি, খাতা খোলার দরকার নেই। সীতারাম আর গোপীমোহনের পর রয়েছে আমাদের অর্জুনপ্রসাদ, বংশী মাঝি আর গদাধর রায়। এই পাঁচজন হল আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর করার লোক। এদের আমরা গ্রুপ 'এ'র মধ্যে ফেলি। অবশ্য তার মধ্যেও একটা ইতরবিশেষ রয়েছে।"

বরদা বলল, "অর্জুনপ্রসাদের স্পেশ্যালিটি কী?" বলে হালকা মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অর্জুনপ্রসাদ বেহারী। তার বাড়ি মুঙ্গেরে। বয়েস বছর চব্বিশ। অর্জুনপ্রসাদ ছেলেবেলায় তার বাবার সঙ্গে তুলোর দোকানে কাজ করত। বাবা মারা যাবার পর সে এখানে-সেখানে কাজ করে বেড়িয়েছে। শেষে ও রেল-স্টেশনে চাঅলার কাজ করত। আমরা যখন তাকে নিয়ে আসি, তখন অর্জুনের অসুখ। লোকে বলত, তাকে ভূতে ধরেছে। এখানে আসার

পর ধীরে-ধীরে সে ভাল হয়ে ওঠে।"

"তা না হয় হল, কিন্তু অর্জুনপ্রসাদের বিশেষ ক্ষমতাটা কী?"

"সেটা আপনাকে আগে বলব না। নিজের চোখেই দেখবেন।" সিদ্ধেশ্বর এমন মুখ করলেন যেন রহস্যটা চাপা দিয়ে রেখে মজা পাচ্ছেন।

বরদা বলল, "বেশ, স্বচক্ষেই দেখা যাবে।...আপনার অন্য দুই ওয়ান্‌ডার ম্যানের কথা বলুন—বংশীবদন আর, কী বললেন যেন, গদাধর?" বরদা হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বংশীকে আমরা জোগাড় করেছি কয়লাকুঠি থেকে। তার বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর। বংশীর বয়েস বছর পঞ্চাশ। ও চোখে দেখতে পায় না। তার মানে বংশী জন্মান্ধ নয়, একবার আগুনের এক হলকা লেগে তার মুখের চামড়া পুড়ে যায়, চোখও অন্ধ হয়ে যায়। বংশী অন্ধ। আপনি ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু ওই বংশীকে আপনি অন্ধকারে বাইরে নিয়ে আসুন, সে আপনাকে হাতে ধরে এখানকার প্রত্যেকটি জায়গায় নিয়ে যাবে, কোথায় কী আছে বলে দেবে, কে সামনে এসে দাঁড়াল তাও জানিয়ে দেবে। এমন কী—বংশী আপনাকে আকাশের কোথায় কোন তারা ফুটে আছে তাও বলে দিতে পারবে।"

বরদার বিশ্বাস হল না। বলল, "অন্ধরা অভ্যাসবশে অনেক-কিছু পারে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু কোনো অন্ধই তার অভ্যস্ত জীবনের বাইরে কিছু পারে না। বংশী পারে। আপনি নিজেই দেখবেন।"

বরদা আর ঘাঁটাল না। বলল, "এবার আপনাদের গদাধরের ইতিহাসটা শুনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "গদাধর পেশায় ছিল কুমোর। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। হাঁড়িকুড়ি গড়ত। হাটে-বাজারে বেচত। তার মা বসন্ত রোগে মারা যায়। মা মারা যাবার পর থেকে গদাধর কেমন হয়ে যায়, খেপাটে গোছের। নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াত। একবার সে কোন শ্মশানে গিয়েছিল এক তান্ত্রিক সাধু দেখতে। তারপর কী হয়েছিল আমরা জানি না, গদাধরও বলতে পারে না। কিন্তু ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দেয়। গদাধর এমন অনেক কিছু আগে থেকে অনুভব করতে পারে যা আমরা পারি না।"

"যেমন" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যেমন, অশুভ কিছু ঘটার আগে গদাধর হঠাৎ আপনাকে বলে দিতে পারে, কী ঘটবে। আপনাকে সাবধান করে দিতে পারে। সত্যি বলতে কী, আমাদের এখানে একজন ছিল, যে গদাধরের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ওকে এখানে নিয়ে আসে। অথচ এমনই কপাল, গদাধর

তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে দুমকা যাচ্ছিল সাইকেলে চেপে। তখন বর্ষাকাল। বাজ পড়ে মারা যায়।"

বরদা বলল, "এ-রকম আর-একজনের কথা আপনি আমায় আগেও বলেছেন।"

"হ্যাঁ, এক সন্ন্যাসীর কথা। সূর্যপূজারী। আমার বাবা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

"গদাধর কি সেই ধরনের মানুষ?"

"না, গদাধর সাধারণ মানুষ; খেপাটে। তার কোনো সাধনভজন নেই। কখনো-কখনো নিজের মনে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান গায়, ঠাকুর-দেবতার গান। সে আমাদের এই বাগানটাগান নিয়ে সময় কাটায়। নিজের মতন থাকে। তাকে কেউ কিছু বলে না।"

"আমি বোধ হয় তাকে দেখেছি। বাগানে।"

"দেখতে পারেন।"

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। বললেন, "চলুন, আমরা ওদিকে যাই।"

বাইরে এসে দাঁড়াল বরদারা।

খানিকটা বেলা হয়েছে। রোদ দেখে মনে হয় দশটার কাছাকাছি। আকাশ পরিষ্কার। গাঢ় নীল। উঁচুতে বুঝি চিল উড়ছে। লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথা থেকে কাঠ কাটার শব্দ ভেসে আসছিল। বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে কেউ কাঠ চেরাই করছে।

বরদা বলল, "আপনাদের এই পি পি রিসার্চ সেণ্টার বাইরে থেকে দেখলে কেমন যেন আশ্রম-আশ্রম লাগে, মশাই। মনেই হয় না—এখানে কিছু অ্যাবনরম্যাল লোকজন জুটিয়ে রেখেছেন।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে যারা থাকে তাদের দেখলে আপনি চট করে কিন্তু বুঝতে পারবেন না কারও কোনো অস্বাভাবিকতা রয়েছে। দু-এক জায়গায় অবশ্য পারলেও পারতে পারেন। ...ওই যে দেখুন—ওর নাম গোপীমোহন।"

বরদা তাকাল। টালি-ছাওয়া ব্যারাক-বাড়ির সামনে একটা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে।

লোকটিকে বরদা কালও দেখেছে। যদিও বরদা এখানে নতুন, তবু পুরো একটা দিন তার এই চৌহদ্দির মধ্যে কেটেছে, নামে না জানুক—চোখে অন্তত সবাইকেই প্রায় দেখেছে কাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনাকে যে জনা পাঁচেকের কথা বলেছি, তারা ছাড়া আরও জনা পাঁচ-ছয় রয়েছে এখানে, যাদের আমরা অতটা নজর করি না, কিন্তু তারাও আমাদের চোখের বাইরে থাকে না। মজাটা কী জানেন বরদাবাবু, সাধারণ মানুষ যেভাবে খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, কাজ করে, এরা

এখানে সকলেই প্রায় সেইভাবে থাকে। কখনো-কখনো ওদের মধ্যে কারও ব্যবহারে ইতরবিশেষ দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর আলাদা করে নজর দিতে হয়।"

"সবাই কি ওই টালির বাড়িতে থাকে?"

"না। পাশের বাড়িতেও থাকে।"

"তা আপনাদের এমন কোনো ঘরটর নেই যেখানে এদের ওপর পরীক্ষা চালান?"

"আছে বই কী। এই খড়ের ঘরের পাশে, এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে, ছোট ছোট দুটো ঘর আছে। একটায় কিছু ওষুধপত্তর থাকে। অন্য ঘরটায় দরকার মতন পরীক্ষা করা হয়।"

"কে করে?"

"সতীশ।"

"কে সতীশ?"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। তাকে দেখেননি আপনি। সে এখানে একটানা থাকে না। সপ্তাহে দুবার করে আসে। যেদিন আসে, সেদিন থেকে যায়। আজ তার আসার দিন। নয়ত কাল আসবে।"

"সতীশ কি ডাক্তার?"

"হ্যাঁ। ডিগ্রী আছে। আবার সাইকোলজিস্ট।"

বরদা কোনো কথা বলল না।

টালি দেওয়া বাড়িটার কাছাকাছি এসে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখানে যারা আছে তারা মানুষ হিসেবে যতই অদ্ভুত হোক, সকলেই প্রায় সরল সাধারণ, লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না, কেউ কেউ নিরক্ষর। আমি এদের কাছে বলব, আপনি জলের পাম্প কম্পানির লোক, কলকাতা থেকে দেখতে এসেছেন, জলের কী ব্যবস্থা করা যায়। ওরা কেউ কিছু বুঝবে না। আপনাকে কোনো গোলমেলে কথাও জিজ্ঞেস করবে না। মহাদেবই আপনাকে জ্বালাতে পারে। ওই লোকটাই ধুরন্ধর, শঠ। একটা জিনিস আপনি লক্ষ করবেন, যতক্ষণ আমি আপনার কাছাকাছি থাকব, মহাদেব এ-পাশে ঘেঁষবে না। আপনি কি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন?"

"না," বরদা মাথা নাড়ল। মহাদেবকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

"কাল বিকেলে ওকে দেখেছিলেন?"

"লক্ষ করিনি। তবে চোখে পড়লে মনে থাকত।"

"কাল থেকেই ও গা ঢাকা দিয়ে আছে।"

"কেন?"

"টাঙাঅলা।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "টাঙাঅলা তো ওর কোনো ক্ষতি

করেনি।"

"না," মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর, "টাঙাঅলা ওর কোনো ক্ষতি করেনি।"

"তবে?"

সিদ্ধেশ্বর অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তার ক্ষতি করতাম। আপনাকে আমি যখন নিয়ে এলাম এখানে, তখন থেকেই ও বুঝেছে ওর সর্বনাশ করার জন্যেই আমি আপনাকে এনেছি।"

বরদা ভাল বুঝতে পারল না কথাটা। বলল, "আপনি যদি এতই বুঝেছিলেন তা হলে—"

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার দুটো ভুল হয়েছিল। বড় ভুল। আমি বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি মহাদেব আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবে, আর এই রকম ভয়ংকর এক শিক্ষা। আগে বুঝতে পারলে টাঙাঅলাকে আমি বাঁচাতে পারতাম।"

বরদা বলল, "অন্য ভুলটা কী করলেন?"

"সুজন মালাকার। আমি কল্পনাই করিনি সুজন মালাকার আশে-পাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। এখন বুঝতে পারছি, এই মহাদেব শয়তান সুজনকে পুষে রেখেছিল। মানুষ যেভাবে তার ডালকুত্তা পোষে, মহাদেব সেইভাবে আমাদের চোখের আড়ালে সুজনকে পুষছিল। তাক বুঝে তাকে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা কথা বলতে পারল না। সিদ্ধেশ্বরের চোখমুখ যেন রাগে, ঘৃণায়, ক্ষোভে টকটকে হয়ে উঠেছে।

মাত্র কয়েক পা হেঁটে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "বরদাবাবু, আমার প্রথম কাজ হবে সুজনের খবর নেওয়া। সে এখানে কোথায় আছে? কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে? কাল সে কোথায় ছিল? কখন সে টাঙাঅলার গাড়িতে চেপেছে?"

বরদা বলল, "এসব খবর আপনি কার কাছে পাবেন?"

"অর্জুনপ্রসাদের কাছে।"

"অর্জুনপ্রসাদ কি মহাদেবের দলে?"

"না। কিন্তু অর্জুনপ্রসাদ পারে। ওর এই ক্ষমতা আছে। যদি ভগবান দয়া করেন, অর্জুন আমাদের অনেক কিছু বলে দিতে পারবে। চলুন।"

বরদা কিছুই বুঝল না, সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

অর্জুনপ্রসাদ তার ঘরে ছিল না। সামান্য তফাতে গাছতলায় কাঠ-কুটো নিয়ে কাজ করছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকলেন।

অর্জুন যেন এক দৌড়ে চলে এল। সিদ্ধেশ্বরকে খুব খাতির করে যে বোঝাই যায়। তবে বরদার মনে হল না, অর্জুনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা আছে। তার চেহারা থেকে সেটা অন্তত একেবারেই বোঝা যায় না। চব্বিশ বছরের জোয়ান চেহারা কি এই? মাথায় বেঁটে, গায়ে খরা, মুখে দু-চারটে দাগ বসন্তের। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। পরনে একটা পাজামা, গায়ে ছাই রঙের শার্ট। বরদা লক্ষ করে দেখল, অর্জুনের চোখ দুটোই যা বড় বড়, মুখের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, আর প্রায় গোল ধরনের দেখতে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কী করছিলে?"

অর্জুন কেমন যেন লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকে বলল, "পিন্‌জ্‌রা।"

সিদ্ধেশ্বর একটু হাসলেন। তারপর ইশারা করে বললেন, "তোমার সঙ্গে দরকার আছে। অন্য কোথাও চলো।...ঘরে যাবে?" না, থাক—; তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে ডেকে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

সামান্য একটু এগিয়ে সিদ্ধেশ্বর সেই ছোট ছোট দুটো ঘরের একটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন দুটো ঘরেরই দরজায় তালা। তাঁর কাছে চাবি নেই।

অর্জুনকে পাঠাতে পারতেন সিদ্ধেশ্বর চাবি আনতে, পাঠালেন না; নিজেই চলে গেলেন। বরদাকে বললেন, "দাঁড়ান, আমি আসছি।"

বরদা আর অর্জুন দাঁড়িয়ে থাকল।

কৌতূহল হচ্ছিল বরদার। অর্জুনের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করল। অর্জুন বেশ মজার বাংলা বলে, দেহাতি হিন্দী মেশানো বাংলা, শুনতে ভালই লাগে।

"তোমার বাড়ি কোথায়, অর্জুন?"

"মুঙ্গের।"

"দেশে কেউ আছে?"

"কোই না, বাবু।"

"এখানে কত দিন আছ?"

"দো সাল, কুছ জাদা, বেশি হবে বাবুজী।"

"তুমি কি খাঁচা তৈরি করতে পার?"

অর্জুন সরল মুখ করে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর ফিরে এলেন চাবি নিয়ে।

ছোট ঘরের একটার তালা খুললেন। বরদারা ভেতরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় এটা ওষুধপত্র রাখার ঘর। এক কোণে একটা আলমারি, কাচের পাল্লা। আলমারির মধ্যে নানা ধরনের শিশি, বোতল, কৌটো। দেওয়াল-তাকে পেটমোটা জার। একটা মাইক্রসকোপও রাখা আছে। আরও কিছু টুকিটাকি।

মাত্র একটা চেয়ার, সরু বড় টেবিল আর বেঞ্চি ছাড়া ঘরে অন্য আসবাব নেই। ঘরটা ছোট, নড়াচড়ার জায়গাও কম।

সিদ্ধেশ্বর জানলা দুটো খুলে দিলেন।

বরদাকে বসতে বললেন চেয়ারে। তারপর অর্জুনের দিকে তাকালেন। বললেন, "অর্জুন, আমি সুজনের খবর চাই।"

অর্জুন তাকাল। অবাক হয়েছে যেন। বলল, "সুজন! ও তো ভেগে গেছে, বাবু।"

"না। আমরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও যায়নি। আমার বিশ্বাস আশেপাশে কোথাও আছে! তুমি চেষ্টা করে দেখো যদি ওকে দেখতে পাও।"

অর্জুন কিছুক্ষণ সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর অর্জুনকে বেঞ্চিতে বসতে বললেন।

অর্জুন বসল। বসে ঘরের চারদিকে তাকাল, তারপর জানলার দিকে বার-বার তার চোখ ফেরাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারলেন, বাইরের আলো অর্জুনের পছন্দ হচ্ছে না।

"জানলা বন্ধ করে দেব?"

"থোড়া দিন।"

জানলা পুরো বন্ধ না করলেও অনেকটা ভেজিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার অবাক লাগছিল। অর্জুন কেমন করে সুজনের খবর জানবে?

অর্জুন বেঞ্চির ওপর বসে একটু সময় চোখ বুজে থাকল, তারপর তাকাল। মাথা তুলে ছাদ দেখল, দু হাতের তালুতে নিজের চোখ ঢেকে রাখল কিছুক্ষণ।

সিদ্ধেশ্বর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে।

অর্জুন হাত সরিয়ে নিল মুখের ওপর থেকে। নিচু মুখ করে বসল এবার, ঘাড় হেঁট।

বরদা অর্জুনকে দেখছিল। ঘরের মধ্যে আলোর ভাব কমে এসে ছায়া-

ছায়া দেখাচ্ছে। বাইরে থেকে হাল্কা শব্দ ভেসে আসছিল মাঝে-মাঝে। পাখির ডাকও। অর্জুন নিচু মুখ করে বসে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল। চোখের পাতা বোজা। বরদা দেখল, অর্জুনের মুখের চেহারা পালটে গেছে। ঠিক কেমন যে দেখাচ্ছিল বরদা বুঝল না, তবে তার মনে হল—মানুষ যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, কিংবা আধো-আধো ঘুমে, তাহলে অনেকটা এইরকম দেখাতে পারে। একে কি সম্মোহিত অবস্থা বলে? কে জানে? অর্জুনের মুখ শান্ত, ঘুম-ঘুম। স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্বাস নিচ্ছিল।

আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। সিদ্ধেশ্বর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর পলক পড়ছে না। তিনি যেন প্রত্যাশার মুখ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

অর্জুন কিছুই বলছিল না। ঠোঁট বুজে আছে। একটুও নড়াচড়া করছে না।

বরদার কৌতূহল থাকলেও সে অর্জুনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। অর্জুন কি ধ্যান করছে? কিসের ধ্যান?

শেষ পর্যন্ত অর্জুনের গলায় শব্দ ফুটল। অস্পষ্ট: কপাল কুঁচকে গেল, মুখের পেশীটেশি কাঁপল সামান্য। অর্জুন বলল, "সুজন—সুজন আছে।"

"দেখতে পাচ্ছ?" সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"হাঁ।" মাথা আরও উঁচু করল।

"কী দেখতে পাচ্ছ?"

"সুজন খাটিয়ায় বসে আছে।"

"কোথায়?"

"পেড় আছে, লোটা আছে, একটা কুত্তাও আছে। পিছে..."

"কী আছে পেছনে?"

অর্জুনের কপাল আরও কুঁচকে গেল। চোখের পাতাও। যেন সে দেখবার চেষ্টা করছে সুজনের পেছনে কী আছে।

বরদা অবাক হচ্ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করছিল না। একটা লোক এই ঘরের মধ্যে বসে দূরে কে কোথায় কেমন করে বসে আছে জানতে পারে না। জানা সম্ভব নয়।

অর্জুন বলল, "মালুম গাঁওকে ঘর। সুজন ঘরকে সামনে বসে আছে।"

"কোন গাঁও তুমি বুঝতে পারছ?"

"না বাবুজী।"

"সুজন কী পরে আছে?"

"লুঙ্গি। গায়ে কুর্তাভি আছে।"

"কোনো চোট আছে ওর? দেখতে পাচ্ছ?"

"চোট নেহি।"

"তুমি আরও একটা জিনিস দেখতে পাবে, অর্জুন?"

"কী বাবুজী?"

"ওই টাঙাঅলাকে তুমি দেখেছ। তুমি কি বলতে পারো, সুজন কাল টাঙাঅলার গাড়িতে উঠেছিল কিনা?"

অর্জুন চুপ করে গেল। তার চোখ আরও কুঁচকে থাকল কিছুক্ষণ, মাথাটা উঁচু করল। তারপর বলল, "না বাবুজী! আমি কুছু দেখতে পাচ্ছি না।"

সিদ্ধেশ্বর আবার বললেন, "পাচ্ছ না?"

"না বাবুজী!"

"আজ তুমি সুজনকে দেখতে পাচ্ছ?"

"জী।"

"সে কোনো গাঁয়ে লুকিয়ে রয়েছে। কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে। ঠিক আছে, তোমায় আর দেখতে হবে না, অর্জুন।"

অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুলল না। সামান্য পরে খুলল। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

সিদ্ধেশ্বর এগিয়ে গিয়ে জানলা দুটো খুলে দিলেন।

ঘরের আলোয় বরদা দেখল, অর্জুনের কপাল মুখ গলা গল-গল করে ঘামছে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

সিদ্ধেশ্বর অর্জুনকে বললেন, "তুমি এবার যাও, অর্জুন। বাইরে হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াও।"

অর্জুন চলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। সুজন এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। ঘাপটি মেরে।"

বরদা বলল, "আপনি অর্জুনের কথা বিশ্বাস করলেন?"

"করলাম।-কেন?"

"আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। অর্জুন এই ঘরে বসে চোখ বুজে কেমন করে সুজনকে দেখতে পায়?"

সিদ্ধেশ্বর একটু হাসলেন। "পায়। অর্জুন অনেক কিছু দেখতে পায়—যা আমরা পাই না। ওর এই আশ্চর্য শক্তি আছে।"

"যতই শক্তি থাক, ঘরে বসে অনেকটা দূরে কে কী করছে তা দেখা সম্ভব নয়।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনার আমার পক্ষে নয়। অর্জুনের পক্ষে সম্ভব। ভগবান তাকে ওই আশ্চর্য ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন। সব সময় সবকিছু

ও দেখতে পায় না। কখনও-কখনও পায়। যেমন টাঙাঅলার গাড়িতে সুজন কাল ছিল কিনা—অর্জুন দেখতে পেল না। অথচ আজ এখন সুজন কোথায় আছে, কোন বেশে, সে দেখতে পেল। আমরা অর্জুনকে অনেকবার পরীক্ষা করেছি—সে যা বলেছে তা প্রায়ই মিলে গেছে।"

বরদার বিশ্বাস হল না। বলল, "আপনি যে মিথ্যাকথা বলছেন তা নয়, তবে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। হয়ত আপনি ঠিকই বলছেন। আমি ভাবছি, এ-রকম দৈবক্ষমতা মানুষের কেমন করে হয়?"

সিদ্ধেশ্বর তর্ক করলেন না। বললেন, "কেমন করে হয় জানার চেষ্টাই তো আমরা করছি, বরদাবাবু। এর কোনো ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দিতে পারব না। কেউ-কেউ বলেন, এটা সিক্সথ সেন্স। আদিম মানব জাতির মধ্যে নাকি ছিল। ক্রমে তা হারিয়ে গেছে। তবে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, কোটিতে এক আধজনের মধ্যে তার একটু ছায়া এখনও থেকে গেছে।"

বরদা কিছু বলল না। চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। বলল, "চলুন বাইরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বরও উঠলেন।

বাইরে এসে বরদা সিগারেট ধরাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, আমাদের এখানে আরও যারা আজব মানুষ রয়েছে তাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।" বলে একটু হাসলেন।

বরদা বলল, "চলুন।"

সকালে যা বিশ্বাস করেনি বরদা, কিংবা তার বাধছিল বিশ্বাস করতে, রাত্রে সে সেটা বিশ্বাস করে নিল।

তেমন একটা রাতও হয়নি। বরদা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে নানা রকম কথা ভাবছিল—হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ। তারপর দরজা খুলে মহাদেব ঘরে এল।

বরদা চমকে গিয়েছিল। সে আশাই করেনি মহাদেব তার ঘরে আসবে।

মহাদেব যেন পা টিপে-টিপে সামনে এল। দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল। তার চোখের তলায় ঘৃণা, ওপরে অবজ্ঞার হাসি।

বেশ বিনীত ভঙ্গিতে নমস্কার করল মহাদেব। ঠাট্টাই করল। "ভাল আছেন স্যার?"

বরদা বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। বিরক্ত চোখে দেখল মহাদেবকে। বলল, "আপনি আমার এখানে কেন? কী মনে করে?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয় না। নতুন মানুষ। খোঁজখবর নিতে এলাম।"

বরদা বলল, "আপনাকেই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে।"

"আমি আপনাকে ঠিকই দেখি।"

"তা দেখতে পারেন।"

মহাদেব বসল না। দাঁড়িয়েই থাকল। দাঁত-চাপা হাসি। একেবারে শয়তান যেন। চোখ ছোট-ছোট করে দেখছে আর চাপা হাসি হাসছে।

মহাদেব বলল, "আপনি নাকি কলকাতার কোন্ টিউবওয়েল কম্পানির লোক?"

"হ্যাঁ।"

"কোন কম্পানি?"

"সেটা আপনার জানার কোনো দরকার নেই। আমায় বিরক্ত করবেন না।"

"আপনি কি কিছু ভাবছেন?"

"হ্যাঁ"। বরদা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অসহ্য লাগছিল লোকটাকে। তার কেমন যেন সন্দেহও হচ্ছিল।

মহাদেব শব্দ না করে হাসল। বলল, "সিধুবাবু এখন নেই। বাইরে বেরিয়েছেন সাইকেল নিয়ে। আপনি একা আছেন, তাই একটু গল্প করতে এসেছিলাম।"

"আমার এখন গল্প করার ইচ্ছে নেই।"

"ভাবছেন কিছু? টিউবওয়েলের কথা?" মহাদেব যেন খোঁচা মারল।

"হ্যাঁ। আপনি আমায় বিরক্ত করবেন না।"

মহাদেব গ্রাহ্য করল না। রসিকতা করে একটা সিগারেট চাইল।

বরদা সিগারেট দিল। মহাদেব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ওড়াল। তারপর বলল, "আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা বলে দিতে চাই।"

জবাব দিল না বরদা।

মহাদেব বলল, "আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, সিধুবাবু আপনাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন। এসে ভাল করেননি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

বরদার মাথা গরম হয়ে উঠল। "নিজের চরকায় তেল দিন।"

"আমার চরকায় তেল দেওয়া বন্ধ করে দেবার জন্যে আপনাকে আমদানি করেছেন সিধুবাবু। তিনি ভুল করেছেন। আপনি ভুল করবেন না।"

"যদি করি?"

"করবেন না। আফসোস করতে হবে।"

বরদা মহাদেবের চোখ দেখতে-দেখতে বলল, "যদি করতে হয়—করা যাবে।"

মহাদেব যেন রেগে গেল। বলল, "আপনি আমায় অবজ্ঞা করছেন?"

"করতেও পারি," বরদা বলল। সে নিজেই বুঝতে পারছিল না তার এত সাহস কেমন করে হচ্ছিল। বোধ হয় মহাদেবের ওপর ঘৃণা থেকে।

মহাদেব বলল, "শুনুন, আপনাকে সোজা বলি, আপনি যদি কাল-পরশুর মধ্যে কলকাতায় ফিরে না যান, আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।"

"কেমন বিপদ?"

"ভাবছেন আমি মজা করছি আপনার সঙ্গে।...আপনাকে আমি যে-বিপদে ফেলতে পারি—"

বরদা হঠাৎ কেমন খেপে গেল। বিছানা থেকে নেমে পড়ে বলল, "আমায় মেরে ফেলতে পারেন—এই তো?"

মহাদেব কঠিন গলায় বলল, "পারি।"

দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বরদা বলল, "যেমন করে টাঙাঅলাকে মেরেছেন?"

মহাদেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বলল, "হ্যাঁ। টাঙাঅলার কথাটা একটু ভাববেন। সে যেভাবে মারা গেছে আপনি অবিকল ওইভাবে মরতে পারেন। ঘাড় মটকে ঘুরে যাবে, ঘাড়ের দিকে মুখ হয়ে যাবে আপনার।" মহাদেবের চোখ জ্বলছিল। "আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই ওকে মেরেছি।"

বরদা চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সুজন মালাকার তাহলে আপনার হাতেই রয়েছে?"

মহাদেব বলল, "হ্যাঁ। সুজন আমার। এখানকার নয়। সুজন আমার হাতে। আমি কাউকে পরোয়া করি না। সে যে কী ভয়ংকর আপনি জানেন না।"

বরদা জানে। শুনেছে। বলল, "সুজনকে আপনি পুষে রেখেছেন?"

"রেখেছি।"

"সিদ্ধেশ্বরবাবু ঠিকই ধরেছেন।"

"ধরবেন বই কী!...তিনি তো সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছেন সুজনের খোঁজ করতে। আশপাশের গ্রামে গিয়ে দেখবেন সুজন কোথায় লুকিয়ে আছে। দেখুন, তিনি সুজনকে খুঁজে পান কিনা। কিংবা তিনিও টাঙা-অলা হয়ে না যান!"

বরদার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। বলে কী মহাদেব?

মহাদেব আর দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর না ফেরা পর্যন্ত বরদা ভয় আর উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করল। শান্তভাবে সে বসতে পারছিল না। একবার করে বাইরে যাচ্ছিল, এগিয়ে গিয়ে দেখছিল সিদ্ধেশ্বরের ঘরে বাতি জ্বলছে কি না। আবার নিজের ঘরে ফিরে আসছিল।

সে ভীতু মানুষ, অকারণ কোনো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেও তার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু আজ মহাদেব মানুষটাকে তার এতই খারাপ লেগেছে যে, বরদার রাগ হচ্ছিল ভীষণ। ঘৃণাও। লোকটা বদমাশ নয় শুধু, নৃশংস। কত তুচ্ছ কারণে সে টাঙাঅলাকে খুন করাল। বরদার বাস্তবিকই খানিকটা সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন। এখন আর তার কোনো সন্দেহ নেই, মহাদেব নিজের মুখে স্বীকার করেছে, টাঙাঅলার মৃত্যুতে তার হাত রয়েছে, সুজনকে দিয়ে খুন করিয়েছে টাঙাঅলাকে। কিন্তু কী দরকার ছিল নিরীহ টাঙাঅলাকে খুন করার? বরদাকে ভয় দেখানোর জন্যে মিছিমিছি একটা মানুষ খুন! লোকটা জন্তু না পিশাচ?

সিদ্ধেশ্বর ফিরলেন আরও খানিকটা পরে।

বরদা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সিদ্ধেশ্বরের ঘরের দিকে ছুটল।

ঘরে ঢুকে সিদ্ধেশ্বর সবে বসেছেন, বরদা এসে দাঁড়াল।

"আপনি মশাই আমায় বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন," বরদা বলল, "আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।"

"কেন?"

"শুনলাম আপনি সুজনের খোঁজ করতে বেরিয়েছেন সাইকেলে চড়ে, একা-একা?"

ঘরে জল ছিল খাবার। সিদ্ধেশ্বর নিজেই জল গড়িয়ে নিয়ে খেলেন। বললেন, "বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

বরদা বসল।

সিদ্ধেশ্বরকে সামান্য ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললেন, "আপনাকে কে বলল আমি সুজনের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম?"

"মহাদেব।"

"মহাদেব?"

বরদা মহাদেবের কথা বলল, লোকটা বরদার ঘরে ঢুকে কেমন করে

শাসিয়ে গেছে, তার বিবরণ দিল। "আমায় বলল কী জানেন? সুজনকে খুঁজতে গিয়ে আপনিই না টাঙাঅলা হয়ে যান।"

সিদ্ধেশ্বর শুনছিলেন সব। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমি তো বেচারা টাঙাঅলা নই। তা ছাড়া আমি জেনেশুনেই গিয়েছি। মহাদেব কেমন করে ভাবল আমি হাত খালি করে সুজনকে খুঁজতে যাব!" বলে সিদ্ধেশ্বর জামা তুলে কোমরের কাছে একটা চামড়ার বেল্ট-মতন দেখালেন। একপাশে ছোরার খাপ, সরু লম্বা মতন, মামুলি ছোরাছুরি নিশ্চয় নয়। সরু, লম্বা ছোরা বোধ হয়।

বরদা অবাক গলায় বলল, "আপনি এসবও জানেন?"

জামাটা কোমরের ওপর আবার ফেলে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। "জানি। যাদের সঙ্গে ঘর করি, তারা তো সাদামাটা মানুষ নয়। যাকগে ও-কথা। মহাদেব আপনাকে শাসিয়ে গেল তা হলে?"

"দুদিন সময় দিয়েছে কলকাতা ফিরে যাবার জন্যে।"

সিদ্ধেশ্বর যেন ভাবছিলেন। চোখের পাতা বুজে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, "মহাদেব নিজেকে যতটা ধূর্ত মনে করে ততটা নয়। তাছাড়া ও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটার-পর-একটা ভুল করে যাচ্ছে।"

"ভুল?"

"টাঙাঅলাকে কেন মারতে গেল! টাঙাঅলা না মরলে সুজনের কথা আমি জানতে পারতাম না। তারপর ও যখন বুঝল, ধরা পড়ে গিয়েছে, আপনাকে শাসাতে এল। মহাদেব ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলে এখন আর সামলাতে পারছে না। বোকার মতন কাজ করছে। এখন ও ভুল করবে। মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।"

বরদা বলল, "আপনি এবার তা হলে ওকে ধরুন।"

সিদ্ধেশ্বর কোনো জবাব দিলেন না। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছিল। শিস উঠছে একপাশে। বাতিটা কমিয়ে দিলেন। সিদ্ধেশ্বরের ঘর সাধাসিধে, খাট আছে, দেরাজ আছে একটা, টেবিল আর চেয়ার। সামান্য ক'টা বই।

বরদা বলল, "মহাদেবকে আর আপনি এগুতে দেবেন না। আবার কাকে মেরে বসবে!"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধরার আগে সুজনকে ধরতে চাই।"

"তার কোনো খোঁজ পাননি?"

"পেয়েছি। কিন্তু ধরতে পারিনি। ও কাছেই গন্‌ডিয়া বলে একটা গাঁয়ে ছিল, সেখানে আট-দশ ঘর কাঠুরিয়া থাকে। ওই গাঁ ছেড়ে ও অন্য কোনো জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। কোথায়, তা কেউ বলতে পারল না। আমি তিন-চারটে গাঁ ঘুরে এলাম। সুজনকে দেখেছে সকলেই—অথচ বলতে

পারছে না সে কোথায় রয়েছে।"

বরদা তেমন একটা অবাক হল না। এই ফাঁকা, বসতিহীন জায়গা, দু-একটা ছোট ছোট দেহাতি গ্রাম, এখানে ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা এমন কী কঠিন। আবার এই জায়গা এমন যে, একবার কাউকে চোখে দেখলে তার পক্ষে গা-আড়াল দিয়ে বেশিদিন থাকাও মুশকিল। ভিড়ে মিলিয়ে যাবার সুযোগ নেই।

"সুজন কি পালিয়ে গেছে?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"মনে হয় না পালিয়েছে।"

"কেন?"

"মহাদেব কি তাকে ছেড়ে দেবে?"

"মহাদেবের সঙ্গে ওর এত খাতিরই বা কিসের?"

সিদ্ধেশ্বর ম্লান হাসলেন। বললেন, "শয়তানের সঙ্গে শয়তানেরই খাতির হয়।...তবে সুজন বোকা, নির্বোধ। ওর ওই পাশবিক শক্তি ছাড়া কিছু নেই। তাও খানিকটা ভৌতিক। মহাদেব ওকে কিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাত করেছে।"

বরদা বলল, "কিন্তু লোকটার ভয় থাকতে পারে। মানুষ মারার পর সে যদি বুঝে থাকে—ধরা পড়লে পুলিসের হাতে পড়তে হবে, তাহলে তো পালাতেও পারে।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "সুজনের সেটুকু বুদ্ধিও নেই। ও হল জন্তু। বুদ্ধি বলে কিছু থাকলে মহাদেবের পাল্লায় পড়ে! না, অকারণ একটা মানুষকে ওইভাবে মারে?"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

বাইরে এসে বরদা চারপাশে তাকাল একবার। শান্ত। ঠিক যেন কোনো আশ্রম; কোনো-কোনো ঘরে আলো জ্বলছে, কোনোটা অন্ধকার; সাড়াশব্দও তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, গাছ পাতার মাথায়-গায়ে চাঁদের আলো। শীত-শীত করছে। এমন শান্ত নির্জন জায়গায় কেমন করে এই খুনোখুনি, শয়তানি এসে ঢুকল! আশ্চর্য!

বরদাকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার সন্দেহ, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। সুজন ছাড়াও তার দলে লোক আছে।"

বরদা বলল, "কেমন করে বুঝলেন?"

"না বুঝলে আর বলছি কেন! সুজনের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে কে? আছে কেউ। আমার বিশ্বাস, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। তার মতলব ছিল, জনা তিন-চার লোক নিয়ে সে যদি চলে যেতে

পারে, বাইরে গিয়ে একটা ভেলকিবাজির ব্যবসা ফাঁদবে। টাকা-পয়সা কামাবে। দেখতে-দেখতে বড়লোক হয়ে উঠবে।"

বরদা বলল, "অত সোজা?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সোজা বলেই তো বলছি। মানুষ রহস্য জিনিসটা ভালবাসে, পছন্দ করে। এটা শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সর্বত্রই। আমাদের এখানে আরও বেশি। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস, অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখার জন্যে ধরনা দেওয়া আমাদের স্বভাব। এ-দেশে ভগবানের চেয়ে ভগবানের চেলাদের প্রতিপত্তি বেশি। তাই না?"

বরদা অস্বীকার করতে পারল না। এই রকমই তো হয়, কে কোথায় তামার মাদুলি হাতে নিয়ে সোনা করে দিয়েছে, কে এক পুরিয়া ছাই খাইয়ে মরমর রোগীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এ-সব শোনা মাত্র মানুষ ছোটে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মহাদেব ভেতরে-ভেতরে এই মতলবই এঁটেছিল। সে এখান থেকে দু-তিন জনকে হাত করে নিয়ে যাবে, তারপর বাইরে গিয়ে পয়সা-কড়ি লুঠবে।" বলে একটু থামলেন তিনি; আবার বললেন, "আমরা এখানে যাদের এনেছি, তাদের দেখিয়ে পয়সা করতে তো চাই না, আমরা চাই মানুষের—কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে যে অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য শক্তি আছে—তার একটা ব্যাখ্যা বার করতে। আমাদের উদ্দেশ্য আলাদা। মহাদেবের অন্য মতলব।"

বরদা বলল, "সুজন ছাড়া আর কাকে-কাকে মহাদেব হাত করেছে?"

সিদ্ধেশ্বর হাঁটতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে। কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, "সেটা খুঁজে বার করতে হবে। তবু আমার ধারণা, গোপীমোহনকে সে দলে টানতে পারে।"

"গোপীমোহন! যাকে বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ-পনেরো মিনিট শুইয়ে রেখে তুলে নেবার পর দেখতে-দেখতে আবার গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে?"

"হ্যাঁ, তাকেও টানতে পারে।"

"কেন?"

সিদ্ধেশ্বর একবার বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "গোপী একসময় খেলা দেখাত, বলেছি না আপনাকে? ছোট-ছোট সার্কাস পার্টির লোক তাকে ভাড়া করে নিয়ে মেলায়-মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত। গোপীকে খেলা দেখানোর কাজে ব্যবহার করা খুব সোজা। কাজও দেবে। মহাদেব তার ভক্তদের বোঝাতে পারবে সে একটা মানুষকে কেমন আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে পারে। স্বয়ং ভগবান সে।"

বরদা বলল, "সীতারামকেও কি হাত করেছে মহাদেব?"

"না। সীতারামকে দিয়ে ওর সুবিধে হবে না। সীতারাম, অর্জুন, বংশী মাঝি, গদাধর, এদের মহাদেব নিতে পারবে না। ওরা নির্লোভ। তা ছাড়া

মহাদেবের ফাঁদে তারা পা দেবে বলে মনে হয় না।"

"তা হলে আর কে থাকল?"

"আছে। আপনি তাকে দেখেছেন হয়ত, কিন্তু পরিচয় জানেন না।"

"কে?" বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

"চাঁদু। ভাল নাম শীতল।...দেখেননি তাকে? মাথায় বেঁটে, গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা, কপালের কাছে কাটা দাগ, টেরা চোখ...। সাইকেল নিয়ে হরদম ছোটাছুটি করে।"

বরদার মনে পড়ল। বলল, "দেখেছি।"

"চাঁদুকে আমরা অর্জুনদের দলে ফেলি না। তার অত উঁচু দরের ক্ষমতা নেই।"

বরদা তার ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। বাতি জ্বলছে ঘরে, দেখা যাচ্ছে না। জানলা দরজা বন্ধ।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চাঁদু যে-কোনো মানুষের গলা বার কয়েক শোনার পর নকল করতে পারে। এত ভাল নকল করতে পারে যে, আসল আর নকল ধরা যায় না। তাছাড়া তার অন্য গুণ হল সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী। এখানে তার অনেক কাজ। আমরা তাকে কাজের জন্যে রেখেছি, অন্য কোনো কারণে নয়।"

বরদা চাঁদুর ব্যাপারটা ভাল বুঝল না। বলল, "চাঁদুকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে মহাদেবের কিসের লাভ হবে?"

"তা হবে।...আপনি এখন বুঝতে পারছেন না। যে মানুষ উপস্থিত নেই, যদি আড়াল থেকে তার গলা আপনি শুনতে পান, আপনার কি মনে হয় না লোকটা আশেপাশে কোথাও রয়েছে?" সিদ্ধেশ্বর একবার আকাশের দিকে মুখ তুললেন, আবার নামালেন। "সহজ একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি রাত্তিরে ঘুমোচ্ছেন, বাইরে থেকে আমার গলা করে চাঁদু ডাকল। আপনি নিশ্চয় ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবেন। তারপর দেখবেন, সুজন ঘরে ঢুকছে—চাঁদু আড়ালে সরে গেছে।"

বরদা কথাটা বুঝতে পারল। ভয়ও পেল। বলল, "বলেন কী! মহাদেব আমার ঘরে ওইভাবে সুজনকে ঢুকিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন। "না, তা বোধ হয় করবে না মহাদেব। তবে চাঁদুকে হাতে পেলে মহাদেবের 'টিম'টা এখনকার মতন ভাল হবে। যে-কোনো জায়গায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারে, বুজরুকি করে, লোককে ধাঁধা খাইয়ে বড়লোক হয়ে যেতে পারে দুদিনে।"

বরদা দরজায় হাত রাখল, "আসবেন?"

"না, আর যাব না। রাত হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার খাবার এসে হয়ত ফেরত চলে গেছে। খবর দিয়ে দিচ্ছি।

আমার অন্য একটা কাজ আছে।"

"কী কাজ?"

"পরে শুনবেন।...আমারও চোখ আছে সবদিকে। মহাদেব আজ বিকেল থেকে কী কী করেছে, কোথায় গেছে, কার সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়েছে তার খোঁজ নেব।"

বরদা বলল, "আপনি কি এখানে স্পাই রেখে দিয়েছেন?"

"এখন রাখছি। না রাখলে মহাদেব কখন যে কী করে বসবে, বুঝতে পারব না। ভুল একবার হয়েছে, দ্বিতীয় বার যেন না হয়।"

বরদা বলল, "আজ মহাদেব যে আমার ঘরে এসেছিল, এটা আমি না-বললেও আপনি তা হলে জানতে পারতেন?"

"পারতাম। তবে আপনাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, তা জানতে পারতাম না।"

বরদা বোকার মতন হাসল।

দরজার ছিটকিনি তোলা ছিল। সাধারণ একটা তালাও দিয়ে গিয়েছিল বরদা। তালা খুলল।

"আমার ওপর যে মাত্র দু-তিন দিনের নোটিশ আছে মশাই," বরদা বলল, "মহাদেব আমায় টাঙাআলা করে ছেড়ে দেবে বলেছে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেব নিজের ফাঁদে পা দিয়েছে, তার কী অবস্থা হয় দেখুন! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর সাধ্য নেই—আপনার কিছু করে।"

বরদা নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না।

হঠাৎ বরদার কেমন যেন সন্দেহ হল। বাতির আলো এত কম কেন? বিছানার দিকে তাকাল। কিছু নেই। আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। ঘাড় পিঠ নুইয়ে খাটের তলা দেখল। দেখেই মনে হল, খাটের তলায় রাখা তার সুটকেসটা খোলা।

বরদা থতমত খেয়ে গেল। তার ঘরে কেউ ঢুকেছিল। কে এসেছিল আবার? মহাদেব, না অন্য কেউ?

কেন এসেছিল? সিদ্ধেশ্বরকে কি ডাকবে আবার?

বরদা বাইরে বেরিয়ে এল। সিদ্ধেশ্বর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর ডাকল না তাঁকে। কিন্তু ভীত হয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে বেলাই হয়ে গিয়েছিল বরদার। এখানে এসে পর্যন্ত সে ভোরবেলাতেই উঠে পড়ে, বেড়ায়-চেড়ায়, সকালের ঠাণ্ডা অথচ সতেজ হাওয়া খায়, আকাশ দেখে, রোদ ওঠা নজর করে, গাছপালা, পাখি—কত কী লক্ষ করে মুগ্ধ চোখে। তার ভাল লাগে। শরীর-মনও ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আজ আর সকালে উঠতে পারল না বরদা, বেলা হয়ে গেল, চোখ মেলে দেখল, রোদ আসছে জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে।

বাইরে এসে বরদা বুঝল, বেলা অনেকটাই হয়ে গেছে। রোদ আর ফিকে নেই। কাল সারারাত বরদার ঘুম হয়নি। না হবার কারণ মহাদেব। মহাদেব তাকে শাসিয়ে যাবার জন্যে ততটা নয় যতটা অন্য কারণে। মানে, বরদা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, তার ঘরে ঢুকে সুটকেসের ডালা কে খুলেছিল? কেন খুলেছিল? এখানে চোর-টোর থাকার কথা নয়; বরদার ঘরেই বা কেন চুরি করতে আসবে? কী রয়েছে বরদার যে চুরি করবে?

সুটকেসটা বরদা ভাল করে দেখেছে। জামা, প্যাণ্ট, পাজামা, গেঞ্জি—এইসব পোশাক-টোশাক ছাড়া তার সুটকেসে তেমন-কিছু ছিল না। টাকা-পয়সা বরদা সুটকেসে রাখেনি। কিছু তো চোখে পড়ল না বরদার যে বলবে, অমুক জিনিসটা আমার চুরি গিয়েছে! তা হলে চোর কেন এসেছিল? কোন মতলবে? চোর-ই বা কে?

এই বিচ্ছিরি চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তা যেন লেজুড় হয়ে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বর বলছিলেন, বেঁটে-বাঁটকুল চাঁদু অন্য মানুষের গলার স্বর নকল করতে পারে, চাঁদু সিদ্ধেশ্বরের গলা নকল করে মাঝরাতে যদি বরদাকে ডাকে—বরদা নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবে, আর তখন চাঁদুর বদলে হয়ত দেখা যাবে সুজন দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা মহাদেব! কী করবে তখন বরদা?

ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা একবার চেপে বসলে আর কি যেতে চায়? বরদার মাথায় এই সব চেপে বসল। ঘুম আর কোথা থেকে আসবে? বরং সব সময়েই কেমন যেন ছমছমে হয়ে থাকল মনের ভেতরটা। কান পড়ে থাকল দরজায়।

একেবারে শেষ রাতে বরদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ আর জেগে থাকতে পারে মানুষ! ঘুমোবার আগে সে একটা মোটামুটি ধারণা খাড়া

করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা তার মাথায় এসেছে এবার। আসলে সিদ্ধেশ্বর আর মহাদেবের মাঝখানে সে হাজির হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে নয়, নিজের মর্জিতেও নয়, সিদ্ধেশ্বরই বরদাকে হাজির করেছেন; আর মহাদেব সিদ্ধেশ্বরের মতলব ধরতে পেরে বরদার ওপরই বেশি খেপে উঠেছে।

আরও পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভাবলে বোঝা যায় যে, সিদ্ধেশ্বর তাঁদের এই পি পি রিসার্চ সেণ্টারে যাদের এনেছেন, যারা তাঁদের গবেষণার বিষয়—মহাদেব তাদের কয়েকজনকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। মহাদেবের উদ্দেশ্য, বাইরে গিয়ে ভেলকি দেখানো, মানুষ ঠকানো এবং রাতারাতি টাকাপয়সা কামিয়ে বড়লোক হওয়া। মহাদেব চাইছে অর্থ আর প্রতিপত্তি। সিদ্ধেশ্বর চাইছেন মহাদেবকে তাড়াতে। একলা মহাদেবকেই।

বরদা বুঝতে পারল না, মহাদেবকে যদি তাড়ানোই তাঁর ইচ্ছে, তবে সোজাসুজি তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? এত ঘোরপ্যাঁচ কিসের? মহাদেবকে তাড়ানোর জন্যে বরদাকে কলকাতা থেকে ধরে আনার কারণ কী? সিদ্ধেশ্বরের সেই ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব রয়েছে যাতে তিনি সরাসরি মহাদেবকে ঘাড় ধরে এখান থেকে বার করে দিতে পারেন। তবু কেন দিচ্ছেন না? এর রহস্যটা কোথায়?

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছে না। বরং তার মনে হল, যে-কাজ সহজে করা যেত, সিদ্ধেশ্বর সেটা জটিল করে তুলছেন অকারণে, আর এই জন্যেই একটা অসহায় নিরীহ লোক মারা গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে বরদা সোজা সিদ্ধেশ্বরের অফিস-ঘরে গেল। অফিস-ঘর খোলা। কেউ নেই।

বরদা খোঁজ করতে গেল সিদ্ধেশ্বরের ঘরে। দরজায় তালা ঝুলছে।

এদিক-ওদিক দেখল বরদা, সিদ্ধেশ্বর নেই। কেউ জানে না, তিনি কোথায় গেছেন।

ওপর-ওপর দেখলে কিছুই বোঝা যায় না; যে যার মতন কাজকর্ম করছে, জল উঠছে কুয়ো থেকে, কাঠ চেরাই হচ্ছে, পেছনের সবজি-বাগানে কাজ করছে জনা দুই লোক, গাছের ছায়ায় বসে কেউ গল্প করছে, কেউ বা ঘরেই রয়েছে।

বরদা বুঝতে পারছিল না সিদ্ধেশ্বর কোথায় গেছেন! সুজনের খোঁজেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন নাকি! হতে পারে। মানুষটি জেদী, কাল তিনি বিফল হয়েছেন. আজ হয়ত সফলও হতে পারেন।

এখানে-ওখানে উঁকি মেরে. খানিকটা পায়চারি করে বরদা নিজের ঘরেই ফিরে আসছিল, হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। দাঁড়াল বরদা, কান পাতল, মোটর বাইকের শব্দ। কোন দিক দিয়ে শব্দটা আসছে বোঝা যায় না।

গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা।

সামান্য পরে ফটকের সামনেই মোটর বাইক দেখা গেল। সিদ্ধেশ্বর পেছনে বসে ছিলেন। সামনে নতুন মানুষ।

সিদ্ধেশ্বর নামলেন। ফটক খুলে দিলেন।

মোটর বাইক চালিয়ে যে-লোকটি ভেতরে ঢুকলেন, বরদা তাঁকে লক্ষ করতে লাগল। বয়েস বেশি নয়; তবু বরদার চেয়ে বড়। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ ময়লা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখে চশমা।

সিদ্ধেশ্বর ফটক বন্ধ করে হেঁটে-হেঁটেই আসছিলেন। মোটর বাইক সোজা খড়ের ঘরের দিকে চলে গেল এঁকে বেঁকে।

বরদা কয়েক পা এগিয়ে গেল সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

"কোথায় গিয়েছিলেন? সকাল থেকেই বেপাত্তা!" বরদা সামান্য চেঁচিয়ে বলল।

সিদ্ধেশ্বর অল্প দূরেই ছিলেন, এগিয়ে আসছিলেন। বললেন, "কাছেই ছিলাম।"

বরদা একটু অপেক্ষা করল। সিদ্ধেশ্বর সামনে এলেন।

"সুজনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

"কোনো খবর পেলেন?"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় ডাকলেন বরদাকে। ডেকে হাঁটতে লাগলেন। বললেন, "সুজন এখানেই আছে।"

"এখানে?" বরদা অবাক হয়ে তাকাল। "কোথায়?"

"ধারে-কাছে।"

বুঝতে পারল না বরদা। সুজন যে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে, এ তো আগেও শুনেছে। কিন্তু কোথায়?

"ধারে-কাছে মানে কোথায়?" বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না, হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর অন্য কথা পাড়লেন। "সতীশকে দেখলেন?"

"সতীশ! মানে ডাক্তার?"

"হ্যাঁ।"

বরদারও সেই রকম মনে হয়েছিল একবার। গতকাল সতীশ ডাক্তারের আসার কথা ছিল, আসতে পারেননি; আজ আসার কথা। অবশ্য বরদা ভাবেনি যে, মোটর বাইক চেপে ডাক্তার আসবে।

"উনি কোত্থেকে আসেন?"

"আসে অনেক দূর থেকে। আগে ট্রেনে এসে বাস আর টাঙ্গা করে আসত। আজকাল একটা মোটর বাইক কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড। ওতে চেপেই আসে। ভোর-ভোর বেরোয়, ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে পৌঁছে যায়। আপনার

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আজ ও থাকবে। কাল সকালে আবার চলে যাবে।"

বরদা বলল, "আপনি কি ওঁকে রাস্তায় দেখলেন?"

"হ্যাঁ।"

নিজের ঘরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর। পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুললেন।

বরদা বলল, "কাল একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।"

দরজা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকলেন সিদ্ধেশ্বর। জানলা খুলে রেখে গিয়েছিলেন আগেই। "বসুন...কী ঘটনা ঘটল আবার?"

বরদা কালকের ঘটনার কথা বলল। কে যেন তার ঘরে গিয়ে সুটকেস খুলেছিল। অথচ কিছু নেয়নি, কিছুই চুরি যায়নি।

সিদ্ধেশ্বর রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। বরদা যখন তাঁর ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল কাল রাত্রে, তখন কে তার ঘরে গিয়ে তালা খুলল, সুটকেস হাতড়াল? এমন দুঃসাহস কার হবে?

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিতভাবেই বললেন, "আপনি ভুল করছেন না তো?"

"না।"

"আশ্চর্য...সুটকেস ভাল করে দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"কিছু খোয়া যায়নি?"

মাথা নাড়ল বরদা।

সিদ্ধেশ্বর কিছু যেন ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতেই বললেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। বরদা বসেই থাকল। বসে বসে সিদ্ধেশ্বরের ঘর দেখতে লাগল। জানলা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সাদামাটা অথচ গোছানো ঘর। পুব দিকে একটা পুরনো ধরনের টেবিল। কাগজপত্র, দু-একটা বই, পত্রিকা পড়ে আছে। ফাউন্টেন পেনের কালি। কাচের চৌকোনা পেপার-ওয়েট। পরিষ্কার বিছানা। একটা মাত্র আলমারি একদিকে। দেওয়ালে দু-চারটে ফোটো টাঙানো।

ফিরে এলেন সিদ্ধেশ্বর। বোধহয় চোখে-মুখে জল দিয়ে এসেছেন। ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছিল।

বিছানার একপাশে বসলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনি বোধহয় ভাল করে সুটকেস দেখেননি?"

"কেন?"

"একেবারে অকারণে কেউ সুটকেস খুলতে পারে না!"

"কিন্তু আমি দেখেছি।"

"নজর করেননি, বা খেয়াল করেননি," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ছোট-খাট জিনিস আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।"

"সুটকেসে আমার জামাকাপড় ছাড়া এক-আধটা বই ছিল। আপনি নিজেই দেখেছেন হাওড়া স্টেশন থেকে আমি কিনেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে। একটা বই পড়ছি, বাকি দুটো সুটকেসে ছিল। এ ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। একটা ছোট নোটবই মতন ছিল। তাতে নিজের নাম-ঠিকানা ছাড়া সামান্য কিছু এন্ট্রি ছিল। ওটা কোনো কাজের জিনিস নয়।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, "নোটবইটা আছে?"

বরদা এই আচমকা প্রশ্নে কেমন থতমত খেয়ে গেল। একবার মনে হল, দেখেছে; আবার মনে হল, দেখেনি। ঠিকমতন খেয়াল করতে পারল না বরদা। দমে গিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, দেখেছি।"

সিদ্ধেশ্বর হাসির মুখ করলেন, "আপনি বোধহয় শিওর নন। ঠিক আছে, আমরা পরে গিয়ে দেখব।"

"নোটবই না থাকলে কী হবে?"

"হবে আর কী! আপনার আসল পরিচয়টা ওরা জানতে পেরে যাবে। বাড়ির ঠিকানাও।"

বরদা যেন ঘাবড়ে গেল। বলল, "আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। গিয়ে দেখে আসব একবার?"

"দাঁড়ান না, আমিও যাব।" বলে সিদ্ধেশ্বর জানলার দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "ধরুন যদি নোটবই পাওয়াও যায়, তাতেই বা কী! আপনার বাড়ির ঠিকানা একবার দেখে নিয়ে মুখস্থ করে নেওয়াও যায়, বা কাগজে টুকে নিলেও চলে। কাজেই নোটবইটা থাকা না থাকায় কিছুই আর আসে-যায় না।"

এমন সময় একটা লোক টিনের ট্রে করে চা আর পাঁউরুটি নিয়ে এল।

বরদা সকালের জলখাবার খেয়েছিল, সে শুধু চা নিল।

সিদ্ধেশ্বর লোকটাকে বললেন, "ডাক্তারবাবুকে চা পাঠানো হয়েছে?"

লোকটি বলল, "হয়েছে।"

খিদে পেয়ে গিয়েছিল বোধহয় সিদ্ধেশ্বরের। রুটি-চা খেতে-খেতে বললেন, "আপনার আসল পরিচয় মহাদেব যদি জেনে গিয়েও থাকে, তাতেও আমার অবাক হবার কিছু নেই। সে তো ধরেই ফেলেছে আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি আমার কাজ হাসিল করতে। ও শুধু আপনার কলকাতার বাড়ির ঠিকানা জানত না। সেটা জেনে নিল। জেনে নিয়ে কী কী করতে পারে? এক, আপনার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে পারে, ভয় জাগিয়ে তুলতে পারে বাড়িতে—যাতে বাড়ি থেকে আপনাকে পত্রপাঠ চলে যেতে লেখে। দুই, মহাদেব আপনার নকল সেজে আপনার বাড়িতে যেতে পারে।

না, সেটা সম্ভব নয়। অত সাদৃশ্য আপনাদের চেহারার মধ্যে নেই, তা ছাড়া গলার স্বর। দুজনের গলার স্বর আলাদা। মহাদেব ধরা পড়ে যাবে।"

বরদা একটা সিগারেট ধরাল। "আমি কাল একটা কথা ভাবছিলাম। বলব?"

"বলুন।"

"মহাদেবকে আপনি সরাসরি তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?"

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দিচ্ছি না তার কারণ রয়েছে। একটা কারণ, মহাদেবের মতন মানুষকে তাড়িয়ে দিলে সে বাইরে গিয়ে কী যে করবে, কত লোকের সর্বনাশ করবে তা কেউ বলতে পারে না। অন্য কারণটা হল, মহাদেব আমাদের এখানে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঠিক যে ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ যোগাড় করেছে তা আমিও জানি না। তার দলে ক'জন আছে, তা সঠিকভাবে জানা দরকার। মহাদেবকে তাড়াবার পর যদি দেখি কম করেও আরও তিন-চারজন চলে গেল, তখন কী করব? মহাদেব তো তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাণ্ডব করবে!"

"তারা যাবে কেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"যেতে পারে। আমাদের এই জায়গাটা তো জেলখানা নয় যে, জোর করে আটকে রাখব। নিজের ইচ্ছেয় তারা চলে যেতে পারে।"

বরদা কথাটা ভাবল। সিদ্ধেশ্বর ঠিকই বলেছেন। যদি কেউ চলে যেতে চায় স্বেচ্ছায়, তাকে বাধা দেবার কোনো আইনগত অধিকার পি পি রিসার্চ সেন্টারের নেই।

সিদ্ধেশ্বরের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে বরদার কাছে একটা সিগারেট চাইলেন।

বাইরে এল বরদা সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। দরজা ভেজিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "চলুন সতীশকে দেখে যাই।"

রোদ খুব ঘন। বেলা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। দশটা বাজল বোধহয়। আকাশ হালকা নীল।

বরদা বলল, "সুজনকে দেখতে পেয়েছেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "না, দেখতে পাইনি। তবে বুঝতে পেরেছি ও খুব কাছাকাছি কোথাও রয়েছে।"

"কেমন করে বুঝতে পারলেন?"

"আজ খুব ভোরে উঠে আমি অন্য দিকে গিয়েছিলাম। পশ্চিমের দিকে কিছু বসতি আছে। বেশির ভাগ লোকই খেত-খামার নিয়ে থাকে। খোঁজ-খবর করে করে জানলাম, সুজন গতকাল এদিকেই ছিল। ওকে কাল যে খেতে দিয়েছিল—তার নাম ফাগুয়ালাল। ফাগুয়ালাল কলাইয়ের চাষ করে। ও বলল, সুজন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যায়।"

"কোথায় চলে যায়?"

"সেটা ও জানে না। তবে আমার বিশ্বাস, সুজন জঙ্গলের কাছে যে পোড়ো চালাবাড়ি আছে, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।"

"চালাবাড়ি জঙ্গলে কেন?"

"ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বিট পোস্ট ছিল একসময়।"

"এখান থেকে কত দূর?"

"মাইল দেড়েক।"

"আপনি কি ওখানেই গিয়েছিলেন?"

"না।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "দিনের বেলায় সুজনের মুখোমুখি হওয়া মুশকিল। ও যদি দেখতে পায়, আমার গা ঢাকা দেবার উপায় থাকবে না।"

"আপনি আপনার সেই অস্ত্র নিয়ে যাননি?"

"সঙ্গে ছিল। তবে সামনা-সামনি সুজনকে ঘায়েল করার ক্ষমতা আমার নেই। তার গায়ে যে ক্ষমতা, তাকে আসুরিক বলা যায়। সুজনের সঙ্গে দিনের বেলায় লড়তে যাওয়া পাগলামো। পিস্তল, রিভলবার থাকলে আলাদা কথা।"

"কিন্তু কাল তো আপনি দুপুরেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

"খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। কোথায় থাকতে পারে আন্দাজ করতে গিয়েছিলাম।" বলে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপর বরদার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, "আপনি শুনলে অবাক হবেন, সুজন দিনের বেলায় সবই দেখতে পায়, কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পর ওর চোখের জোর কমে যায়, রাত্রের দিকে সুজন প্রায় অন্ধ। রাত্রে ওর চোখের জোর নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু চোখ যত যায়, তার ঘ্রাণশক্তি তত বাড়ে। ভাল জাতের শিকারী কুকুরের মতন তখন ওর নাক-ই সব। সুজনকে যুঝতে হলে রাত্রেই সুবিধে। তবে রাত্রে ও শিকারী কুকুর, ভয়ঙ্কর। বরদাবাবু, আমার কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

বরদা তাকাল। "কী দুশ্চিন্তা?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি বলছেন, আপনার সুটকেস থেকে কিছু খোয়া যায়নি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কিছু নিশ্চয় খোয়া গিয়েছে। ছোট-খাট কোনো জিনিস, যা আপনার নজরে পড়েনি। যেমন ধরুন, রুমাল, গেঞ্জি কিংবা এই রকম কিছু।"

বরদা অবাক গলায় বলল, "রুমাল বা গেঞ্জি চুরি করে কী হবে?"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে ভয় দেখাতে চাইছিলেন না; যতদূর সম্ভব সাধারণ গলায় বললেন, "সুজনের জন্যে দরকার। সুজন আপনাকে দেখেনি। চেনে না। আপনি এই চৌহদ্দির বাইরেও যান না। এমন হতে পারে, মহাদেব

আপনার ব্যবহার করা কোনো জিনিস সুজনের কাছে পৌঁছে দিতে চায়।"

"আমার জিনিস! কেন?"

"গন্ধ। আপনার ব্যবহার করা জিনিসে যে গন্ধ থাকবে, সেই গন্ধ শুঁকে সুজন আপনাকে চিনে নেবে। কুকুর যেমন চিনে নেয়। শিকারী কুকুর। এই গন্ধ চিনেই সুজন যে-কোনো দিন রাত্তিরে হানা দিতে পারে আপনার ঘরে।"

বরদা চমকে উঠল। সিদ্ধেশ্বর কি তার সঙ্গে তামাশা করছেন? ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন মিছেমিছি? নাকি যা বলছেন তা মোটেই তামাশা নয়? নিজেও কি বিচলিত হয়ে পড়েছেন সিদ্ধেশ্বর? কিন্তু এটাই বা কেমন করে হয়? সুজন দিনের বেলায় চোখে দেখতে পায়, রাত্রে পায় না। দিনে সে চোখে দেখে শয়তানি করে, আর রাত্রে গন্ধ শুঁকে। সুজন কি তাহলে অর্ধেক মানুষ-শয়তান আর বাকি অর্ধেক পশু-শয়তান?

হঠাৎ কেমন উত্তেজিত, অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে বরদা বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আমায় চলে যেতে দিন। এমন জানলে আমি এখানে আসতাম না। এটা মশাই রিসার্চ সেন্টার, না খুনোখুনির জায়গা! আপনাদের রেষারেষির মধ্যে আমায় কেন টেনে আনলেন? মহাদেব, সুজন, যার যা খুশি করুক, আমার কী! আমায় ছেড়ে দিন।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনাকে ছেড়ে দেব কেমন করে বরদাবাবু? আপনাকে ছেড়ে দিলেও কি আপনি পৌঁছতে পারবেন? যদি টাঙাঅলার মতন হয়ে যায়, তখন?"

বরদার চোখের পাতা পড়ল না। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে লাগল। আর আজই প্রথম, তার কেমন যেন ঘৃণা হল সিদ্ধেশ্বরের ওপর। সব জেনে-শুনেই ভদ্রলোক বরদাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন।

বরদার ঘরে এলেন সিদ্ধেশ্বর।

মন মেজাজ খারাপ ছিল বরদার। কথাবার্তাও বলছিল না সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। সে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে চায়। সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন, মহাদেব সুজন কাউকে তার বিশ্বাস নেই। ঘরে আসার সময় বরদা এ-কথাও ভাবছিল যে, মানিককে একটা চিঠি লিখে দেবে কিনা এখানে চলে আসতে। চিঠি বা টেলিগ্রাম কোনোটাই এখান থেকে সরাসরি করা যাবে না। ছুটতে

হবে দুমকা। সেটা কি সম্ভব!

ঘরে এসে বরদা খাটের তলা থেকে সুটকেসটা টেনে বার করল। করে বিছানার ওপর রাখল।

সিদ্ধেশ্বর প্রায় পাশেই দাঁড়ালেন। বরদার বিরক্তি, উদ্বেগ, আতঙ্ক সবই তিনি বুঝতে পারছিলেন। ঘাঁটাচ্ছিলেন না বরদাকে। বরং নিজেও চুপচাপ কিছু ভাবছিলেন।

সুটকেস খুলে বরদা বলল, "নিন দেখুন।" রাগের মাথায় বলল। দেখার কথা তার, সিদ্ধেশ্বরের নয়।

সিদ্ধেশ্বর শান্ত গলায় বললেন, "আগে নোটবইটা দেখুন। তারপর যা যা আছে একে-একে নামিয়ে, বিছানায় রাখুন।"

বরদা মোটা পুলওভারটা তুলে নিল। ওপরেই ছিল। শীতের কথা ভেবে এনেছিল। তেমন কিছু ঠান্ডা এখনও পড়েনি এখানে। পুলওভার ছাড়াই চলে যাচ্ছিল। তা ছাড়া এখানে এসে পর্যন্ত তো ঘরে বসেই দিন কাটছে, গায়ে চড়াবার দরকারও হয়নি।

পুলওভার তুলতেই নোটবইটা পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিল বরদা। "এই তো নোটবই।" বলে পাতা ওলটাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর বিন্দুমাত্র পুলকিত হলেন না। বললেন, "ভাল কথা। তবে নোটবই থাকলেও যা, না-থাকলেও তাই। মহাদেব যদি আপনার কলকাতার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে থাকে, সেটা পেয়ে গেছে। টুকে নিয়েছে অন্য কাগজে। এবার আপনি অন্য সব দেখুন। আপনার কি মনে আছে, সুটকেসে কী-কী ছিল?"

বরদার মতন বেখেয়ালের মানুষের পক্ষে অত মনে রাখার কথা নয়। কলকাতা থেকে আসার সময় সে যে কী নিয়েছিল কেমন করে বলবে। ফর্দ করে তো নেয়নি। বউদি একটা জিনিস নিতে বলে, মা আর-একটা বলে, ঠিক ঠিক যে কী নিয়েছিল সে জানে না। মোটামুটি মনে আছে।

বরদা একটা-একটা করে জিনিস তুলে বিছানার ওপর রাখতে লাগল : বুশ শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, গেঞ্জি, জাঙিয়া, দাড়ি কামানোর ব্লেড এক প্যাকেট, এক শিশি লোশান, মাথা ধরার বড়ি কয়েকটা, রুমাল।

সবই তো রয়েছে। বরদা খেয়াল করতে পারল না, কোন্ জিনিসটা নেই। বলল, "আমার কিছু মনে পড়ছে না। সবই রয়েছে দেখছি।"

সিদ্ধেশ্বর এক-নজরে সুটকেসটা দেখছিলেন। জিনিস তাঁর নয়, তিনি কেমন করে বুঝবেন, সুটকেসে কী ছিল, কী-বা খোয়া গিয়েছে।

খানিকটা যেন হতাশই হলেন সিদ্ধেশ্বর; বললেন, "নিন, সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলুন।"

বরদা বলল, "মহাদেব কি তাহলে আমার ঠিকানা নিয়ে সরে পড়ল?"

সিদ্ধেশ্বর কোনো জবাব দিলেন না।

বরদা সুটকেস গোছাতে লাগল।

ঘরের চারদিকে অকারণে তাকাতে লাগলেন সিদ্ধেশ্বর। দেখার মতন কিছু নেই। ফাঁকা দেওয়াল, একটা ছোট-মতন দেওয়াল-তাক। একদিকে কাঠের র‍্যাক, জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে। বরদার পাজামা গেঞ্জি পাঞ্জাবি ঝুলছে।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়ল সিদ্ধেশ্বরের। বরদার দামী মজবুত শু-জুতো রাখা রয়েছে।

চোখ সরিয়েই নিচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর, হঠাৎ তাঁর কী যেন মনে পড়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনি মোজা আনেননি?"

বরদা অবাক চোখে তাকাল। "মোজা! হ্যাঁ, মোজা আনব না কেন?"

"ক জোড়া এনেছেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে বরদার খেয়াল হল, সে একজোড়া মোজা পরে এসেছিল, আর-এক জোড়া তার সুটকেসে ছিল। ক্রীম রঙের মোজা, নাইলনের। কিন্তু মোজাটা তো দেখল না সুটকেসে।

হয়ত খেয়াল করেনি; ভুল হয়ে গেছে। বরদা দ্রুত হাতে সুটকেস থেকে আবার সব নামিয়ে ফেলল। খুঁজল। মোজা নেই। তাকাল সিদ্ধেশ্বরের দিকে, "আমার একজোড়া মোজা নেই। ক্রীম রঙের।"

সিদ্ধেশ্বর চোখ ফিরিয়ে জুতোর দিকে তাকালেন। "জুতোটা দেখুন তো?"

বরদা সুটকেস ফেলে রেখে জুতোর দিকে গেল। কোমর নুইয়ে এক পাটি জুতো তুলে নিল। কী আশ্চর্য! তার ক্রীম রঙের মোজা জুতোর মধ্যে গোঁজা।

অন্য পাটিটাও তুলে নিল। সেই একই ব্যাপার। ক্রীম রঙের মোজা-জোড়া ছিল সুটকেসে। সেগুলো জুতোর মধ্যে এল কেমন করে? আর এই জুতোর মধ্যে যে চেক-কাটা মোজা ছিল, যা সে পরে এসেছিল সে-দুটো কোথায়?

বরদা বিহ্বল গলায় বলল, "তাজ্জব ব্যাপার! আমার নতুন মোজা এই জুতোর মধ্যে কে গুঁজে দিয়ে গেছে। আর পুরনো জোড়া নেই।" বলে বরদা ঘরের চারদিকে পুরনো মোজার জন্যে তাকাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "আপনার পুরনো মোজাই চুরি করেছে।"

"পুরনো মোজা! কেন? নতুনটাই বা কেন জুতোর মধ্যে রেখে গেল?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "নতুনটা রেখে গেছে অন্য কারণে। আপনি জুতো পরার সময় অত খেয়াল করবেন না। সাধারণত কেউ করে না। মোজা না

থাকলে বরং জুতো পরার সময় খেয়াল হয়, মোজা গেল কোথায়! তাই না?"

বরদা বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "পুরনো মোজা চুরি করার কারণ?"

"মহাদেবের কাজে লাগবে। প্রথমত মোজাটা আপনি পরেছিলেন। আপনার পায়ের গন্ধ রয়েছে। নতুনটায় না থাকতে পারত।"

বরদা চমকে উঠল। "তার মানে ওই পুরনো মোজা-জোড়া মহাদেব সুজনকে দিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলালেন, "আমার সেই রকম মনে হয়। আপনাকে আমি একটু আগেই বললাম, সুজন রাত্তিরে প্রায় কানা হয়ে থাকে, কিন্তু তখন তার ঘ্রাণশক্তি শিকারী কুকুরের মতন হয়ে ওঠে। সুজন আপনাকে দেখেনি, চেনে না; তবু সে যদি আপনার মোজার গন্ধ শুঁকতে পায়, আপনাকে ঠিক চিনে বার করে নেবে।"

বরদার গা যেন শিউরে উঠল। বিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু যা-সব কাণ্ড-কারখানা এখানে সে দেখছে, তাতে অবিশ্বাস করা যায় না। হতে পারে সুজন মানুষ হলেও তার মধ্যে কুকুরের এই গুণ রয়েছে। পুলিসরা যে কুকুর পোষে, তাদের কাজই তো হল গন্ধ শুঁকে খুনে বদমাশদের ধরার চেষ্টা। না, অবিশ্বাসের কিছু নেই। সুজন সবই পারে। যে-মানুষ একজন নিরীহ টাঙাঅলার ওপর চড়াও হয়ে তার মুণ্ডুটাকেই দুমড়ে ঘাড় ভেঙে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কাজ কীই বা থাকতে পারে।

বরদা ব্যাকুল গলায় বলল, "আপনি বলছেন, মহাদেব এইবার সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। বলার কিছু নেই। মহাদেবকে আর বেশি এগুতে দেওয়া উচিত নয়, সে এখন খেপে গেছে, আবার একটা মানুষ খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বরদা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। বলল, "আপনি চুপ করে থাকলেই হবে? আমাকে কেন আপনি টেনে আনলেন এখানে?"

সিদ্ধেশ্বর বোবা হয়ে থাকলেন।

বরদা ছটফট করছিল। সুটকেসটা ঠেলে দিল। বলল, "আমি কলকাতায় ফিরে যাব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। ওসব সুজন-টুজন আমি জানি না। আপনি নিজে না পারলে, অন্য লোকজন দিয়ে আমায় রামপুরহাট পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি চলে যাব।"

সিদ্ধেশ্বর এবার কথা বললেন। "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা তো রয়েছি।"

বরদার অসহ্য লাগল। বলল, "আপনারা থেকেও তো এত কাণ্ড হচ্ছে!

কী করতে পারছেন আপনি? মহাদেব আপনার নাকের ওপর শয়তানি চালিয়ে যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছেন না।...তা আপনাদের ব্যাপার আপনারা সামলান, আমাকে দয়া করে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, আর নয়—।"

সিদ্ধেশ্বর বুঝলেন, বরদাকে এখন আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বললেন, "বেশ, আপনি যদি সত্যিই ফিরে যেতে চান সে-ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আপনাকে আমি বলছি, মহাদেবের অত সাধ্য হবে না যে, এখানে বসে সে আপনার ক্ষতি করবে!"

"করছে, তবু বলছেন তার সাধ্য হবে না!"

"না, মহাদেব এখন পর্যন্ত আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। আপনাকে সে সাবধান করছে, ভয় দেখাচ্ছে। ক্ষতি করার ফন্দি আঁটছে অবশ্য, কিন্তু পারবে না।...থাকগে, আমি সতীশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান চলুন।"

বরদার কোনো আগ্রহ হল না। বলল, "আপনি যান।"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতাম।"

মাথা নাড়ল বরদা। সে যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন।

বরদা সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বসে পড়ল বিছানায়। না, আর এক মুহূর্তও তার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। কলকাতাতেই সে ফিরে যেতে চায়। মানিক ঠিকই বলেছিল, বলেছিল, "তুই যাস না বরদা, ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবি।" ঠিকই বলেছিল।

দুপুর কাটল। বিকেলও কেটে গেল। বরদা ঘরে বসে-বসেই সময় কাটাল। কখনও বই পড়ার চেষ্টা করল, কখনও চুপচাপ শুধু শুয়ে থাকল, ভাবল। বিকেল পড়ে যাবার পর সে বাইরে এসে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। একটা ব্যাপার দেখে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। পি পি রিসার্চ সেণ্টারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ, অথচ কারও যেন মাথাব্যথা নেই, ভয় নেই, যে যার মতন কাজকর্ম করছে, ঘুরছে ফিরছে। মহাদেব কিংবা সুজনকে নিয়ে ওদের ভাবনা-চিন্তা না হবার কারণ কী?

বিকেল শেষ হবার মুখে মুখেই একজন এসে বরদাকে খবর দিল, সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকছেন।

বরদা বলতে যাচ্ছিল, সে যাবে না। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, "আসছি।"

লোকটা চলে গেল।

বরদা ঘরে ঢুকে সুটকেসে চাবি দিল। কাল চাবি দেওয়া ছিল না। দরকার হত না চাবি দেবার। বাইরে এসে দরজায় তালা দিল। পলকা শস্তা

তালা। থাকা না-থাকা সমান। কাল তো তালা দেওয়াই ছিল। তবু তার ঘরে লোক ঢুকেছিল কত সহজে।

মাঠ বাগান পেরিয়ে বরদা সিদ্ধেশ্বরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরে সিদ্ধেশ্বর একা ছিলেন না; সতীশ ডাক্তারও ছিল।

বরদা আসামাত্রই সিদ্ধেশ্বর স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আসুন। আপনার সঙ্গে সতীশের আলাপ করিয়ে দিই।"

আলাপ হল। সতীশকে খারাপ লাগার কথা নয়, একটু বেশি কথা বলে, গলার স্বর মোটা, গম্ভীর, কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। চোখ দুটো ভীষণ ঝকঝকে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন কিসের এক আকর্ষণে টেনে নিচ্ছে।

সন্ধে হয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে নিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বরই বললেন হঠাৎ, "বরদাবাবু, আপনি কলকাতায় যাবেন বলছিলেন। কাল যদি আপনাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি, কেমন হয়?"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের চোখে চোখে তাকাল। "কখন?"

"সকালের দিকে হবে না। রাত্তিরে একটা গাড়ি রয়েছে।"

"রাত্তিরে?"

"সতীশ আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ও আজ থেকে গেল, কাল সকালে ফিরে যাবে বলছিল, আমি আটকে রাখলাম।"

বরদা ঘাড় ফিরিয়ে সতীশের দিকে তাকাল। সতীশ কিসের একটা কাগজ দেখছে।

বরদা আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। "রাত্তিরে কেন?"

সিদ্ধেশ্বর সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন, "আপনি সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে বসে চলে যাবেন। বেশি সময় লাগবে না।"

বরদার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর যেন জেনেশুনে বুঝে তাকে রাত্রে পাঠাতে চাইছেন। বলল, "রাত্তিরে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?"

"সুজনের কথা ভেবে বলছেন?"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সুজন মোটর-বাইকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবে না—" বলে একটু যেন হাসলেন, "সতীশ ভাল মোটর-বাইক চালায়, ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল..." কথাটা শেষও করলেন না সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ এবার বরদার দিকে তাকাল। বলল, "আপনাকে আমি পৌঁছে দেব। ভাববেন না। আমার অনেক লোক আছে স্টেশনে। গাড়িতে তুলে দেবে আপনাকে।"

এমন সময় একটা লোক চা নিয়ে এল।

সতীশ, সিদ্ধেশ্বর, বরদা চা নিল।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকলেন, "যশোদা কোথায়? তাকে একবার পাঠিয়ে দাও।"

লোকটা চলে গেল।

চা খেতে-খেতে সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "সতীশ, যশোদাকে দিয়ে তুমি ও-কাজটা করতে পারো।"

সতীশ একটু ভাবল। "যশোদা পারবে?"

"আমার মনে হয় পারবে।"

"মহাদেব কি তাকে বিশ্বাস করবে?"

"মহাদেব কাউকেই বিশ্বাস করবে না। তবু তাকে যে-কোনো ভাবে ওষুধটা খাওয়াতে হবে। যশোদা মহাদেবের পাশের ঘরে থাকে, তার ফন্দি-ফিকির জানা আছে অনেক। ওকে দিয়েই চেষ্টা করো।"

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না কথাবার্তার। তার আড়ালে সিদ্ধেশ্বররা কী যে পরামর্শ করেছেন কে জানে। কিন্তু বরদা এটা বুঝতে পারছিল, মহাদেবকে আর বেশি বাড়াবাড়ি করতে দিতে চান না সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল সিদ্ধেশ্বরকে, কাল আমি কলকাতা যাবার সময় আপনি কোথায় থাকবেন?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাছাকাছি থাকব আপনার। ভয় নেই।"

পরের দিন সকাল থেকেই বরদার মন কলকাতার জন্যে ছটফট করতে লাগল। আজ সে ফিরে যাচ্ছে। কাল সকালে তার নিজের বাড়িতে। এই সব মহাদেব, সুজন, এদের হাত থেকে বাঁচবে সে। সিদ্ধেশ্বরের কথায় ভুলে কী বাজে জায়গায় না এসে পড়েছিল। যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। শুধু ভুতুড়েই বা কেন, পৈশাচিক ব্যাপার-স্যাপার! এমন জানলে কে আসত এখানে!

সত্যি বলতে কী, বরদা যে কৌতূহল নিয়ে এসেছিল তা কিন্তু মিটল না। দু-একজন নিশ্চয় তাকে অবাক করেছে, যেমন অর্জুনপ্রসাদ; তবে অবাকের চেয়ে ঘেন্না, বিরক্তি, রাগই তার বেশি হয়েছে। একটা নিরীহ টাঙাঅলাকে কেমন করে মারল এরা। আহা! এখানে গোপীমোহন, বংশী-বদন যারাই থাক, যতই কেননা তাদের অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতা থাক, এদের মধ্যেই আবার মহাদেব আছে, সুজন আছে। শয়তানের দল।

সিধুবাবু তাঁর রিসার্চ সেণ্টার নিয়ে থাকুন, বরদা তার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলেই খুশি।

কলকাতার জন্যে মন ছটফট করলেও ভেতরে-ভেতরে একটা উদ্বেগ বোধ করছিল বরদা। কেমন যেন চাপা ভয়। সতীশ ডাক্তারের মোটর-বাইকের পেছনে চেপে তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে, অনেকটা রাস্তা, তাও আবার সন্ধেবেলা। কেউ কি জোর করে বলতে পারে রাস্তায় কিছু ঘটবে না! সুজন কোথায় ঘাপটি মেরে থাকবে কে জানে!

সবই যখন বুঝছেন সিদ্ধেশ্বর, আর সন্দেহও করছেন, মহাদেব সুজনকে লেলিয়ে দেবার জন্য তৈরি, টাঙাঅলার মতন বরদারও ঘাড় মটকে যেতে পারে—তখন কেন তিনি বরদাকে সন্ধেবেলায় পাঠাচ্ছেন? সকালেও তো পাঠাতে পারতেন?

সিদ্ধেশ্বরের মতলবও বরদার ভাল লাগছিল না। ভদ্রলোক কেমন ফন্দি এঁটে তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন, কত রকম ভেলকি দেখিয়ে! কে জানে, কী মতলব তিনি মনে-মনে এঁটে রেখেছেন? আজ সন্ধেবেলায় বরদার ভাগ্যে কী রয়েছে ভগবানই জানেন!

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন যতই ব্যাকুল হোক, দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বরদার। ভয়ও পাচ্ছিল।

খানিকটা বেলায় বরদা নিজেই সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ করতে গেল। অফিসে তিনি নেই। ঘরেও নয়।

আরও বেলায় বরদা যখন নিজের ঘরে বিরস, শুকনো মুখে শুয়ে-শুয়ে বিকেলের কথা ভাবছে, সিদ্ধেশ্বর তার ঘরে এলেন।

বরদা বিছানার ওপর উঠে বসল। "আপনাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে এলাম।"

"শুনেছি," সিদ্ধেশ্বর বললেন। বসলেন চেয়ারে।

বরদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। লক্ষ করল সিদ্ধেশ্বরকে, তারপর বলল, "আপনি আমার যাবার যে-ব্যবস্থা করেছেন, তাতে আমার কেমন ভরসা হচ্ছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন, চাপা হাসি। বললেন, "ভয় পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ", বরদা স্পষ্ট করে বলল।

"ভয়ের কী আছে! আপনি তো সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে থাকবেন। সে জোরেই গাড়ি চালায়। সুজন কি গাড়ির চেয়েও জোরে ছুটতে পারবে?"

"সে আপনি জানেন। আপনিই বলেছেন সে শিকারী কুকুরের মতন—।"

"সেটা তার ঘ্রাণ-শক্তির বেলায়। পায়ে ছোটার বেলায় নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই সুজনই তো ছুটন্ত টাঙায় উঠেছিল। ছুটন্ত টাঙাও কম জোরে যায় না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন বরদার বোকামিটা দেখছিলেন, বললেন, "টাঙা আর মোটর-বাইকে অনেক তফাত। তাছাড়া, এমনও তো হতে পারে, সুজন টাঙাঅলাকে রাস্তার মধ্যে থামিয়েছিল। টাঙাঅলা কেমন করে জানবে যে, সুজন টাঙায় উঠে তার ঘাড় মটকাবে।"

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। সুজন টাঙা থামাতেই পারে, একা-একা ফিরে যাচ্ছে টাঙাঅলা, মাঠের মধ্যে হাত দেখাল সে, কেনই বা দাঁড়াবে না! তা ছাড়া এদিকে যদি আসা-যাওয়া থাকে টাঙাঅলার, তবে সুজনের মুখ অন্তত চেনা। বেচারা হয়ত ভেবেছিল, সুজন টাঙায় চড়ে খানিকটা যাবে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দিনের বেলায় যাওয়ার চেয়ে সন্ধেবেলায় যাওয়াই তো ভাল। দিনের বেলায় সুজন সবই দেখতে পায়, রাত্তিরে তার চোখের জোর একেবারেই কমে যায়। সেদিক থেকে আপনি নিরাপদ। একজন রাতকানা কতক্ষণ আর মোটর-বাইকের পেছনে-পেছনে ছুটবে?"

বরদা খানিকটা ভরসা পাবার চেষ্টা করল। বাস্তবিকই সুজন যদি রাতকানা হয়ে যায়, তার পক্ষে মোটর-বাইকের পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, সে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা কিছু ছুঁড়তে পারে বরদাদের দিকে। সতীশ ডাক্তার নিশ্চয়ই সেটুকু সামলাতে পারবে।

"আপনি কাল বলেছিলেন," বরদা বলল, "আমরা যখন যাব আপনি কাছাকাছি থাকবেন। কোথায় থাকবেন?"

অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "থাকব। ঠিক কোথায় তা এখন বলতে পারছি না। তবে আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব না।"

বরদা এটা বিশ্বাস করে নিল। সিদ্ধেশ্বর সে-রকম মানুষ নন।

সামান্য চুপচাপ থাকল বরদা। তারপর বলল, "আচ্ছা, আপনি আমায় একটা কথা পরিষ্কার করে বলবেন?...কলকাতা থেকে আপনি আমায় খুঁজে-পেতে, মানে ঘটনাচক্রে আমায় দেখতে পেয়ে এক মতলব ঠাউরে এখানে নিয়ে এলেন। মহাদেবের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে দেখেই ধরে এনেছিলেন আমাকে। কিন্তু এই চেহারার মিল দিয়ে কী করবেন ভেবে-ছিলেন আপনি? মানে, কেমনভাবে সেটা কাজে লাগাবেন ঠাওরেছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর মুখ তুলে বরদার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিছু ভেবেছিলেন। জবাব দেবার কোনো আগ্রহই যেন তাঁর নেই।

বরদা জবাবের আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষে কথা বললেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমার একটা মতলব ছিল। আপনাকে বোধহয় আগেও বলেছি। আপনাকে মহাদেব সাজিয়ে দেখতাম,

তার দলে ক'জন ভিড়েছে এখানকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন হত ব্যাপারটা।"

"আমাকে মহাদেব সাজাতেন?"

"হ্যাঁ। আপনি যদি মহাদেব না সাজেন তাহলে তার সঙ্গে কাদের আঁতাত হয়েছে, কে কে তার দলে ভিড়েছে, কেমন করে জানব!"

"মানে, আমাকে দিয়ে আপনি মহাদেবের পার্ট করাতেন?"

"অনেকটা তাই।"

"আর আসল মহাদেব?"

"তার ব্যবস্থা হত। ওকে একটা দিন বা একটা রাত গুম করে রাখার মতন জায়গা আমাদের এখানে অঢেল।"

বরদা আরও কৌতূহল বোধ করে বলল, "আসল মহাদেব গুম হত, আমি নকল মহাদেব হয়ে কেমন করে তার আঁতাতের লোকদের ধরতাম—সেটা একটু বলবেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "যা হয়নি তা বলে লাভ কী! সুযোগ-সুবিধে বুঝে মতলব ঠিক করতে হয়। আসল মহাদেবই আমাদের যেরকম শিক্ষা দিল, তাতে নকল মহাদেবকে কাজে লাগাবার ভাবনাই ভাবতে পারলাম না।...যাকগে, মহাদেব চাইছিল আপনি কলকাতায় ফিরে যান। সে আপনাকে তিনদিনের সময় দিয়েছিল। একটা দিন দেরি হয়ে গেছে বোধহয়। তাতে কিছু হবে না। আপনি তো ফিরেই যাচ্ছেন। মহাদেব খুশি হবে। মনে হয় না, সে আর আপনার সঙ্গে কোনো শত্রুতা করবে।" বলে উঠে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, "কাল আপনারা, আপনি আর সতীশবাবু মহাদেবকে কিসের ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর চেয়ার সরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আপনি যাতে নিরাপদে চলে যেতে পারেন তাই আপনার যাবার সময় ওকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাখার কথা হচ্ছিল।" বলে সিদ্ধেশ্বর দরজার দিকে পা বাড়ালেন, "দুর্জনকে বিশ্বাস করা যায় না, কী বলেন?"

বরদা বিছানা থেকে নেমে আসছিল; সিদ্ধেশ্বর দরজা পেরিয়ে হঠাৎ মুখ ফেরালেন। তাঁর যেন কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। বললেন, "আপনার সঙ্গে তো মাল কিছুই নেই। সুটকেস সামলে মোটর-বাইকে যেতে পারবেন না। ওটা আগেই দিয়ে দেবেন। স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। গোপাল নিয়ে যাবে।"

"যাবে কেমন করে?"

"সে ভাবনা আমাদের। সাইকেল নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে যাবে, সেখান থেকে বাস ধরবে। তবে বিকেল নাগাদ দিয়ে দেবেন সুটকেস। নয়ত সময়-মতন

পৌঁছতে পারবে না।"

বরদা সুটকেসের কথা আগে ভাবেনি। সত্যিই সুটকেস সামলে মোটর-বাইকের পেছনে বসে রামপুরহাট পর্যন্ত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদা উঠল। বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান-খাওয়া করতে হবে।

দুপুরে আর বরদার ঘুম হল না। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটাল। কাল সে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এতক্ষণ গড়াগড়ি করছে। বিকেলেই বেরিয়ে পড়বে মানিকের খোঁজে। মানিককে সব বলতে হবে, এখানকার কথা।

সিদ্ধেশ্বরকে আজ কেমন গম্ভীর, ক্ষুব্ধ মনে হল। বরদা চলে যাচ্ছে বলেই হয়ত। তিনি নিশ্চয় অনেক কিছুই ভেবেছিলেন। কোনোটাই কাজে এল না। বরদার কোনো দোষ নেই। সে জেদাজেদি করে চলে যাচ্ছে বলে সিদ্ধেশ্বরের রাগ হলেও বরদার কিছু করার নেই। এখানকার ঝঞ্ঝাট যদি মামুলি হত, বরদা সাহায্য করতে পারত সিদ্ধেশ্বরকে। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপারটা খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়েছে, কিছুই করতে পারবে না বরদা। নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না।

দশ রকম ভাবতে ভাবতে বিকেল হল। বরদা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গোছগাছ প্রায় সেরেই রেখেছে, সামান্য যা বাকি আছে সেরে নেবে।

হাত-মুখ ধুয়ে আসতে গেল বরদা। ধুয়ে এসে জামাকাপড় পালটে ফেলবে। গোপাল আসবে সুটকেস নিতে। আর গড়িমসি না করাই ভাল।

একেবারে শেষ বিকেলে সিদ্ধেশ্বর এলেন। বললেন, "আপনার খাবার-দাবার একটা টিফিন কেরিয়ারে করে গোপালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময়-মতন ও আপনার সুটকেস, রাত্রের খাবার আর ট্রেনের টিকিট নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। সতীশ একটু পরেই আসছে।"

"আপনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"আমি যতটা পারি এগিয়ে থাকছি। ঝাড়িখাস বলে একটা জায়গা আছে, ওখানেই থাকব। ওখান থেকেই বিদায় জানাব আপনাকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটা যদি আপনি বুঝতেন—"

বরদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "না না, রাগ করব কেন? আমার নিজের ভুল হয়েছিল। যাক্ গে, ও-সব আর ভাববেন না; যাবার সময় হয়ে এসেছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি যাই।"

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদার তৈরি হওয়ার কিছু ছিল না। সে সাজগোজ সেরেই বসে ছিল। যাবার সময় চুলটা একবার আঁচড়ে নেবে, রুমালে মুখ মুছবে; জুতোটা পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধবে, আর কী!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বরদা অপেক্ষা করতে লাগল সতীশের।

আলোর ফিকে ভাবটুকু দেখতে-দেখতে মুছে গেল কখন। অন্ধকার হয়ে গেল। আবার অন্ধকারের মধ্যে হালকা জ্যোৎস্না ফুটে উঠল ক্রমশ।

সতীশই দেরি করে এল। ডাকল, "আসুন।"

বরদা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। "দেরি হয়ে গেল না?"

"হল একটু। গাড়িটা গণ্ডগোল করছিল। ঠিক করে নিলাম।"

"পেঁছতে পারব তো?"

"বলেন কি! কতক্ষণ আর লাগবে। হাই স্পীডে বেরিয়ে যাব। আসুন।"

বরদা সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে গিয়ে বসল। বলল, "আমার কিন্তু অভ্যেস নেই। আনাড়ি। জোরে যাবেন না।"

সতীশ হাসল। বলল, "ভাল করে ধরে বসুন। এ-সব রাস্তা ভাল নয়। মাঝে-মাঝে লাফাবে।"

স্টার্ট দিল সতীশ। বরদা সতীশকে আঁকড়ে ধরল।

ছোট একটা পাক খেয়ে গাড়ি ফটকের কাছে। মালি ফটক খুলে দিল। একেবারে মাঠে গিয়ে পড়ল মোটর-বাইক।

বরদা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। জায়গাটা তার ভালই লেগেছিল, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার এখানে, মনের স্বস্তি-শান্তি নিয়ে থাকা যায় না। ওপর-ওপর কেমন শান্ত, নিরিবিলি, আশ্রম-আশ্রম মতন, অথচ ভেতরে কী ভয়ংকর!

মোটর-বাইকের শব্দটা প্রথম দিকে কানে লাগছিল। এখন আর লাগছে না। বোধহয় ফাঁকা মাঠেঘাটে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। সন্ধে হয়ে গেছে। আসবার দিন বরদা যে-রকম চাঁদের আলো দেখেছিল, তার চেয়েও খানিকটা যেন স্পষ্ট আলো দেখছে আজ। শীত না থাক, আমেজটা রয়েছে। গাছপালা কালচে। চাঁদের আলো যেন জলের ঝাপটার মতন গায়ে মাথায় লেগে আছে।

হেডলাইট জ্বালানোই ছিল। সতীশ তেমন জোরে যাচ্ছে না। গাড়িটা মাঝে-মাঝেই লাফাচ্ছিল।

যেতে যেতে দু-একটা কথা বলল সতীশ। বাতাসে শোনা যায় না। বরদা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে জবাব দিল। তার মনে এখনও খানিকটা উদ্বেগ রয়েছে। মনে হয় না ভয়ের কিছু আছে, তবু বরদা একেবারে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

সতীশ গাড়ি জোর করল। আলোটা তীরের ফলার মতন সামনের দিকে ছুটছে। আশপাশ নিঃসাড়। মাঝে-মাঝেই ঝোপঝাড় যেন ছুটে এসে রাস্তা আগলে দাঁড়াতে চাইছে, আবার সরে যাচ্ছে। কোথাও বা ফাঁকা মাঠ। উঁচু-নিচু। জ্যোৎস্নার মধ্যে শুয়ে আছে। বিশাল কোনো নিম বা কাঁঠালগাছ

কিংবা অন্য কিছু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

পলাশ-বন এসে গেল। এদিকে যেন আরও পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বরদার মনে হল, এই রকম কোনো একটা জায়গায় সিদ্ধেশ্বরের থাকার কথা। মানুষটি বড় অদ্ভুত। বরদাকে উনি কাজে লাগাতে এনেছিলেন। পারলেন না। একটু যেন দুঃখই হল বরদার।

হঠাৎ সতীশ যেন কী বলল।

বরদা শুনতে পেল না।

গাড়িটা যেতে-যেতে ধীরে হয়ে আসছিল, তার শব্দ বন্ধ হল, তারপর গড়িয়ে-গড়িয়ে সামান্য এগিয়ে থেমে গেল।

"কী হল?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"বুঝতে পারছি না। নামুন। দেখছি কী হল?"

বরদা নামল। সতীশও। নেমে পড়ে গাড়িটাকে স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করাল। তার টুল-বক্সে যন্ত্রপাতি টর্চ রয়েছে। গাড়ির আলো নিবিয়ে দিল সতীশ। টুল-বক্স থেকে টর্চ বার করল।

বরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এ-ভাবে মোটর-বাইক বিগড়ে যাওয়ায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। উদ্বেগও বোধ করছিল।

সতীশ কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও উবু হয়ে বসে কী-সব দেখছিল। দেখতে-দেখতে নিজের মনে যেন কিছু বলল।

আর ঠিক সেই সময় বরদা সামান্য দূরে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠে তাকাল। তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মহাদেব।

যার হাত থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল বরদা, সেই শয়তান মহাদেবই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে এল বরদার। ভয়ে কেমন অদ্ভুত শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সতীশ। হাতের টর্চটা ফেলল মহাদেবের মুখে। জোরালো আলো।

আলো মুখে পড়তেই মহাদেব বোধহয় বিরক্ত হল। চোখের পাতা বুজল। মাথা নাড়ল।

মহাদেবের সামান্য পিছনে সিদ্ধেশ্বর। আগে তাঁকে দেখা যায়নি,

খেয়ালও করেনি বরদা। সিদ্ধেশ্বরকে দেখে যে ভয় পেল তাও নয়, তবু একটু বুঝি সাহস হল।

সিদ্ধেশ্বর বড়-বড় পা ফেলে একেবারে মহাদেবের পিঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাকটা অদ্ভুত। কালো প্যান্ট, কালচে শার্ট। গায়ের সঙ্গে পোশাকটা লেপটে রয়েছে।

বরদার গলা উঠছিল না। বুক ধকধক করছে। বলল, "আপনি?"

সিদ্ধেশ্বর ঠাট্টার গলা করে বললেন, "কাছাকাছি থাকব বলেছিলাম।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করে দেখালেন। "ওকে একটু ভাল করে দেখুন তো! কী মনে হচ্ছে?"

বরদা নজর করে দেখল। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর তার গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। মহাদেবের পরনে বরদার প্যান্ট, বরদার শার্ট, বরদার মতনই দেখাচ্ছে তাকে। আচমকা দেখলে বরদারই যেন মনে হত, সে ভূত দেখছে।

"আমার প্যান্ট, জামা...।"

"আপনার মতনই দেখাচ্ছে না?"

ঘাড় নাড়ল বরদা। দেখাচ্ছে। বলল, "প্যান্ট-জামাও চুরি করেছিল?"

"না। করেনি। আমরা করেছি। সুটকেস থেকে।"

কথাটা ধরতে পারল না বরদা প্রথমে। তারপর বুঝতে পারল। সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই সুটকেস নিয়ে নিয়েছিলেন বরদার, বলেছিলেন গোপালকে দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। বরদা এবার বুঝতে পারল, সিদ্ধেশ্বর ধোঁকা দিয়েছিলেন বরদাকে, ধোঁকা দিয়ে সুটকেসটা হাতিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সুটকেস থেকে প্যান্ট-শার্ট বার করে মহাদেবকে দিয়েছেন পরতে। কিন্তু কেন?

মহাদেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তার নিজের যেন চেতনা নেই। আচ্ছন্নের মতন হয়ে আছে। চোখের পাতা আধ-বোজা, ঘুম-ঘুম ভাব। সামান্য দুলছে। মুখে কথা নেই। বরদাদের দেখছে, কিন্তু খেয়াল নেই।

বরদা বলল, "কী হয়েছে ওর?"

সিদ্ধেশ্বর বাঁকা করে হাসলেন, "ওষুধের গুণ।"

"কী ওষুধ?"

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে দেখিয়ে দিলেন। "ডাক্তার জানে।"

সতীশ দু পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেবের চোখ-মুখ দেখল আবার। মহাদেব আবার বিরক্ত হল। আলো যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সতীশ সিদ্ধেশ্বরকে বলল, "আরও ঘণ্টাখানেক থাকতে পারে। তারপর আর ইনজেকশনের এফেক্ট থাকবে না।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। তুমি এদিকে একটু চক্কর মেরে দেখো।"

টর্চটা নিবিয়ে ফেলল সতীশ। নিবিয়ে বরদার হাতে দিল। বলল, "ধরুন।"

বরদা টর্চটা হাতে নিল।

সতীশ মোটর-বাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বাতি জেবলো না। জ্যোৎস্না রয়েছে। এদিকে ধীরে ধীরে বার কয়েক চক্কর মারতে পারবে না?"

সতীশ জ্যোৎস্নার আলো দেখল। বলল, "পারব বোধহয়।"

"দরকার পড়লে গাড়ির আলো জেবলে নিও। না-জবালানোই ভাল।"

সতীশ কেমন অক্লেশে স্টার্ট দিল গাড়িতে। বরদা বুঝতে পারল না, যে-গাড়ি বিকল হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল এতক্ষণ, সেটা এখন কেমন করে ঠিক হয়ে গেল? এটাও কি ধোঁকা?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সতীশ বলল, "কতটা চক্কর মারব, সিধুদা?"

"ক-তটা আর। সিকি মাইলটাক। আমার মনে হয় সুজন এরই কাছা-কাছি কোথাও রয়েছে।"

সতীশ বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে গিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাল। ঘুরিয়ে পলাশ বনের দিকে আবার ফিরে চলল, ধীরে-ধীরে, মোটর-বাইকের শব্দটা এই ফাঁকায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মহাদেব যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। জড়ানো শব্দ করল। টলে গেল। তারপর বসে পড়ল রাস্তায়। সিদ্ধেশ্বরের পায়ের কাছে। সিদ্ধেশ্বর দু পা পিছিয়ে গেলেন।

বরদার আর ধৈর্য থাকছিল না। তাকে আর কত অবাক করবেন সিদ্ধেশ্বর! পরপর এত কাণ্ড কেন? মনে মনে কী ভেবে রেখেছেন সিদ্ধেশ্বর? বরদার আড়ালে সতীশের সঙ্গে কোনো মতলব এঁটেছেন তিনি?

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতায় পাঠাবার নাম করে এ-সব কী করছেন আমি বুঝতে পারছি না। মহাদেব কোথা থেকে এল? আপনি সুজনকেই বা কেন খুঁজছেন? তার মতন লোককে এই অবস্থায় যেচে কেউ ডাকে?"

সিদ্ধেশ্বর চারপাশ তাকালেন। দেখলেন। বললেন, "আজ আপনার কলকাতা ফেরা হবে না।"

অবাক হল না বরদা। বলল, "আপনি আমাকে কলকাতা পাঠাবার নাম করে অন্য মতলব ঠাউরেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"আমায় বলেননি কেন?"

"বললে আপনি রাজি হতেন না। ভয় পেতেন।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করলেন, "ওর সঙ্গেও একটু চালাকি করলাম।"

"মানে?"

"আপনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন এটা জানার পর মহাদেব কি চুপ করে বসে থাকবে? কী মনে করেন আপনি মহাদেবকে? ও কি মিথ্যে-মিথ্যে আপনার পুরনো মোজা চুরি করেছিল?" বলে মহাদেবের দিকে তাকালেন। "সুজনকে ও তৈরি করে রেখেছে। তাই না মহাদেব?"

মহাদেব মাঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথা টলে পড়েছে বুকের কাছে। তার কোনো হুঁশ নেই।

সিদ্ধেশ্বর একবার টর্চটা জ্বালতে বললেন বরদাকে, জেবলে মহাদেবের মুখের ওপর ফেলতে বললেন।

বরদা টর্চ জ্বালল। মহাদেবের মুখে ফেলল। মনে হল, মহাদেব আর-একটু পরেই হয়ত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

সিদ্ধেশ্বর টর্চ নেবাতে বললেন। বরদা টর্চ নেবাল।

জ্যোৎস্না যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারদিক ফাঁকা, ঝিমঝিম করছে জ্যোৎস্না, পলাশ বনের দিক থেকে মোটর-বাইকের শব্দ ভেসে আসছে, শীতের কুয়াশা জমছে হাল্কা, গাছপালার গায়ে ছায়া আর চাঁদের আলো জড়ানো।

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতা পাঠাবার নাম করে এ-সব কেন করলেন? আমি বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চাইনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার কপাল খারাপ বরদাবাবু, আগে বুঝতে পারিনি এ-রকম একটা ঝঞ্ঝাটে আমাকেও পড়তে হবে।...ও কথা থাক, আজ আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাইলেও পারতেন না। মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না।"

"কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন—?"

"যা বলেছিলাম ভুলে যান। আপনি ভয় পেয়েছিলেন বলে ভরসা দিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আপনি নিশ্চয় করে জানবেন, মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না। আজও নয়। সুজনকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা চারদিকে তাকাল। যেন সুজন কোথাও আছে কিনা দেখল। বলল, "কেন? আমি তো ফিরেই যাচ্ছিলাম। মহাদেব আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছিল। সময় দিয়েছিল তিন দিন। জিজ্ঞেস করুন। আমার একদিন দেরি হয়ে গিয়েছে এই যা।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যে-লোক নিরীহ একজন টাঙাঅলাকে অকারণে

পিশাচের মতন খুন করায়, তার কথা আপনি বিশ্বাস করেন? ও আপনাকেও টাঙাঅলার মতন খুন করত। করবে ভেবেছিল। তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখতেই পাবেন।"

বরদার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। তাকাল মহাদেবের দিকে। না, মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি মহাদেব, দু-হাত দু-পাশে রেখে বসে আছে। লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। মহাদেবের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘৃণা হল বরদার। শয়তানটা কী অক্লেশে বেচারা টাঙাঅলাকে খুন করিয়েছে। নিরীহ, নির্দোষ, হতভাগ্য টাঙাঅলা! টাঙাঅলার তুলনায় বরদা তো মহাদেবের ঘৃণার পাত্র, শত্রু। কেননা বরদাকে কলকাতা থেকে সিদ্ধেশ্বর নিয়ে এসেছিলেন মহাদেবকে শায়েস্তা করতে।

"ও কথা বলছে না কেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"কথা বলার অবস্থায় নেই।"

"কেন?"

"ওর কোনো বোধ নেই। কিছু বুঝতে পারছে না।"

বরদার কানে মোটর-বাইকের শব্দটা অদ্ভুত লাগছিল। সতীশ অনেক কাছে এসে গিয়েছে। তবু দেখা যাচ্ছে না, গাছপালার ছায়ার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে সতীশ আর তার মোটর-বাইক।

"মহাদেবকে আপনারা না ওষুধ খাওয়াবার কথা বলছিলেন?" বরদা বলল।

"ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর আজ ইনজেকশানও করা হয়েছে।"

"কখন?"

"বিকেলে। সতীশ করেছে।"

"কী ইনজেকশান?"

"আমি ঠিক জানি না। সতীশ জানে।"

"ওকে আপনি নিয়ে এলেন কেমন করে এতটা রাস্তা?"

"গরুর গাড়ি করে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "গরুর গাড়ি? কোথায় গরুর গাড়ি? আমি তো দেখিনি?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দেহাতের মানুষ আমরা, গরুর গাড়ি ছাড়া চলে নাকি? গাঁয়ের মানুষদের এটাই তো ভরসা।"

বরদা বুঝতে পারল, গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মহাদেবকে, মানে বেহুঁশ মহাদেবের শরীরটাকে এতটা রাস্তা বয়ে এনেছেন সিদ্ধেশ্বর। কোনো সন্দেহ নেই, বরদারা বেরিয়ে পড়ার অনেক আগেই সিদ্ধেশ্বর বেরিয়ে পড়েছিলেন। উনি তো বরদাকে বলেই এসেছিলেন, 'আমি তা হলে এগিয়ে যাচ্ছি।'

বরদা বলল, "আপনি কি সোজা এই রাস্তা ধরে এসেছেন? দেখতে পেলাম না তো?"

"খানিকটা সোজা এসেছি, তারপর জঙ্গলের মধ্যে মেঠো রাস্তা ধরে।"

"একলা এসেছেন?"

"একলা। মহাদেবের যদিও করার ক্ষমতা কিছু নেই, তবু ওর হাত দুটো বেঁধে রেখেছিলাম।" বলে একটু যেন হাসলেন।

বরদা বলল, "আপনার কি এখানে এসেই অপেক্ষা করার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ। এই জায়গাটাকেই ঝাড়িখাস বলে। পলাশ বনের এই দিকটাকে। কাছেই গ্রাম রয়েছে কাঠুরেদের।"

বরদা বুঝতে পারল, সতীশের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর ভেতরে-ভেতরে এই মতলবটাই তবে এঁটেছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নিজে মহাদেবকে নিয়ে এখানে এসে অপেক্ষা করবেন, আর সতীশ আনবে বরদাকে। সবই মতলব-মতন করা হয়েছে, ছক অনুযায়ী। সতীশের মোটর-বাইক খারাপ হয়ে যাওয়াটা নিছকই ধোঁকা দেওয়া।

সতীশ কাছাকাছি এল। এসে আবার বাইকের মুখ ঘুরিয়ে পলাশ বনের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে বরদা। পা ধরে যাচ্ছিল। মহাদেব মাটিতে বসে। এই মহাদেবকে একেবারে নির্জীব, অক্ষম, অসহায় দেখাচ্ছিল। তার কিছু করার নেই। কথাও বলতে পারছে না। হয়ত বলতেও চাইছে না।

বরদা আবার একবার টর্চ জ্বালল, মুখ দেখল মহাদেবের।

মুখে আলো পড়ায় মহাদেব মাথা তুলল। বিরক্ত হল। কী যেন বলল, তারপর জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল।

টর্চটা নিবিয়ে দিল বরদা।

"মহাদেবকে কী করবেন ভেবেছেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা কিছু করব না। যা করার সুজন করবে।"

"সুজন?"

"সুজন তো মহাদেবের বন্ধু। সে আসুক। দেখুক মহাদেবকে।"

সুজনের নামেই বরদার আবার কেমন ভয়-ভয় করে উঠল। বলল, "সুজন আসবে?"

"আসবে। আসার কথা। মহাদেব তার বন্ধুকে ডেকেছে, আসবে না কেন?"

"মহাদেব কি সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি জানেন ঠিক?"

"বেশ তো, দেখুন না—?"

সতীশ আবার ফিরে আসছে। একবার তার গাড়ির বাতিটা জ্বালল। আবার নিবিয়ে দিল। নির্জন, নিস্তব্ধ এই প্রান্তরে মোটর-বাইকের ফটাফট

শব্দটা কেমন ভৌতিক শোনাতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বরদা বলল, "সুজন যদি আসে, আমরা কী করব?"

"আমরা কিছু করব না। শুধু দেখব। দেখব, সুজনের মুখের সামনে যে শিকার রেখেছি সেই শিকারের কী অবস্থা হয়!"

বরদা চমকে উঠে বলল, "মহাদেব তো সুজনের বন্ধু। সুজন ওর হাতের লোক।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবের গায়ে আপনার প্যান্ট-জামা রয়েছে। সুজন মানুষ চিনবে না, রাত্তিরে সে গন্ধ চিনেই আসবে। চোখেও ভাল দেখতে পাবে না। আর মহাদেবকে তো দেখছেন, তার কথা বলার মতন অবস্থা নেই।"

বরদাকে আর বলতে হল না, সে বুঝতে পারল, সুজন যদি শিকারী কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকে একবার মহাদেবের দিকে চলে আসতে পারে, তবে মহাদেবের আর বাঁচার আশা নেই। কিছুই করতে পারবে না মহাদেব। তার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না নিজেকে বাঁচাবার। টাঙাঅলার মতন অবস্থা হবে তার।

ভয়ে কেমন শিউরে উঠল বরদা। বলল, "মহাদেব মরবে?"

সিদ্ধেশ্বর কঠিন গলায় বললেন, "টাঙাঅলা কেমন করে মরেছিল আপনি কি দেখেছিলেন? মহাদেবকে আজ সেইভাবে মরতে হতে পারে। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে মহাদেব, আমার কিছু করার নেই!"

সতীশ তখন সামান্য দূরে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে কী যেন বলল। শোনা গেল না।

তাকালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "সুজন বোধহয়।"

বরদা কেঁপে উঠল। তাকিয়ে থাকল।

কিছুই নজরে আসছিল না। তারপর চোখে পড়ল, ছায়ার মতন কে যেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

"সুজন?" বরদা বলল, বলেই হাত চেপে ধরল সিদ্ধেশ্বরের।

সুজন এগিয়ে আসছিল। ধীরে-ধীরে। দাঁড়াল একবার। তাকাল যেন এদিক-ওদিক, তারপর পা-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল।

বরদার মনে হল, সুজন চোখে এ-সময় ভাল দেখতে না-পেলেও কানে তো শুনতে পায়, সতীশের গলা সে শুনেছে, শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একবার দেখে নিল। হয়ত সাবধান হল।

মহাদেবের এতটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না বরদার। ভয় করছিল। হাত-পা কাঁপছিল। চাপা গলায় বলল, "চলুন, আমরা সরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার হাত ধরে টানলেন, "হ্যাঁ, এখানে আর নয়।"

বরদা কয়েক পা পিছু হটল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রায় দৌড় দেবার মতন করে অনেকটা পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাছাকাছি একটা ঝোপের সামনে।

সিদ্ধেশ্বর হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন বরদার। তিনিও পিছিয়ে এলেন খানিকটা—তবে বরদার মতন দৌড়লেন না।

বরদা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। জ্যোৎস্নার হালকা ভাবটা কেটে গেছে অনেকক্ষণ; সামান্য গাঢ় দেখাচ্ছিল চাঁদের আলো। ঝিঁঝির ডাকের মতন একটা শব্দ চারদিকে, বাতাসে শীতের কনকনে ভাব। বরদা ভয়ে যতটা কাঁপছিল, শীতে ততটা নয়।

সতীশ তার মোটর-বাইকের এঞ্জিন বন্ধ করে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বরদা দূর থেকে সুজনকে দেখছিল। সবই অস্পষ্ট; তবু মনে হল, চেহারাটা সাধারণ নয়। দৈত্যের মতনই দেখাচ্ছিল তাকে। বেশ লম্বা, এক মাথা চুল, বাবরি ধরনের। বোধহয় গায়ের রঙও কালো। মহাদেবের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর খানিকটা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বরদা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—অত পেছনে নয়, তার থেকে সামান্য এগিয়ে।

মহাদেবের জন্যে দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। শয়তানটা তাকে মারতে চেয়েছিল। টাঙাঅলাকে মেরেছে। তবু এখন অসহায় মহাদেবের জন্যে কেমন যেন দুঃখই হল বরদার। হিংস্র বুনো বাঘের মুখের সামনে দড়ি-বাঁধা ছাগলকে রেখে দিলে যেমন অবস্থা হয় তার, মহাদেবেরও সেই অবস্থা। কিছু করার নেই মহাদেবের।

সুজন মহাদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মহাদেব তার পায়ের কাছে।

বরদার বুক ধকধক করছিল। চোখের সামনে একজন অন্য আরেক জনের ঘাড় মটকাবে—এই দৃশ্য সে দেখতে পারবে না। তার অত সাহস নেই। কলকাতার রাস্তায় কোথাও কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে শুনলে তার ধারেকাছে সে এগোয় না।

চোখ বন্ধ করল না বরদা, কিন্তু সতর্ক থাকল; তেমন কিছু দেখলেই সে চোখের পাতা বুজে ফেলবে।

সুজন মহাদেবকে তুলে ধরেছে। উঠতে পারছে না মহাদেব। টলে পড়ছে। সুজন মহাদেবকে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল জামার। ঝাঁকি দিল। মুঠো করে চুল ধরল; ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। তারপর অদ্ভুত এক শব্দ করল, পশুর মতন।

মহাদেব তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। তারপর কী যে হল, বরদা বুঝল না—, সুজন মহাদেবের গোটা শরীরটা মাথার ওপর তুলে নিল। দু হাতে মহাদেবকে মাথার ওপর তুলে আচমকা ছুঁড়ে দিল। আর্তনাদ করে উঠল মহাদেব। এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে মহাদেবের সেই করুণ আর্তনাদ বীভৎস শোনাল। হাত-পা অসাড় হয়ে এল বরদার।

সুজন দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে। হাত কয়েক দূরে মহাদেব পড়ে আছে। তার আর্তনাদ থামছে না। যন্ত্রণার, কান্নার অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে আসছিল।

সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বরদাকে ডাকলেন, "টর্চটা আপনার কাছে?"

বরদার গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনো রকমে সাড়া দিল।

"আমায় দিন।"

ঝোপ ছেড়ে এগুবার সাহস হল না বরদার।

সিদ্ধেশ্বর নিজেই সামান্য পিছিয়ে এলেন। "দিন।"

বরদা টর্চটা দিল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। দৌড়বেন না।"

"আপনি?"

"আমি সুজনের কাছে যাচ্ছি।"

"সুজনের কাছে?" বরদা চমকে উঠল।

"মহাদেব এখনও মরেনি। মরবে। সুজন আবার তাকে ধরবে। ওই দেখুন—।"

সুজন আবার মহাদেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ধরবে আবার। এবার হয়ত পুরো ঘাড়টাই ভেঙে দেবে। হাত দুটো সাঁড়াশির মতন সামনের দিকে বাড়ানো।

সিদ্ধেশ্বর কিন্তু দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন।

বরদা দেখল, সিদ্ধেশ্বরের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে তাঁর সেই সরু ছোরা। ছোরাটা যে তাঁর সঙ্গে ছিল, বরদা জানত না।

সিদ্ধেশ্বর যে কেন যাচ্ছেন, কী তাঁর মতলব—বরদা বুঝতে পারছিল না। মহাদেব মরছে মরুক, সিদ্ধেশ্বর কেন যাচ্ছেন ওই দৈত্যটার কাছে!

এগিয়ে যেতে-যেতে সিদ্ধেশ্বর চিৎকার করে বললেন, "সুজন—সুজন; আমি এখানে।"

সুজন মহাদেবের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলে নিয়েছিল মাটি থেকে। হঠাৎ ডাক শুনে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে মহাদেবের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

যদিও জ্যোৎস্না তবু সুজন যেন সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না বলেই শুধু নয়, সিদ্ধেশ্বরের গায়ে কালো পোশাক। তাঁকে ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল। তিনি রাস্তার ধার ঘেঁষে এগুচ্ছিলেন, গাছের ছায়ায় গা ঢেকে যেন। কিন্তু জায়গাটা মাঠের মতন, গাছ তেমন একটা নেই।

সুজন চারদিক তাকাচ্ছিল। শব্দ অনুমান করেই। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না।

এগিয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। অনেকটা কাছাকাছি। তারপর টর্চ জ্বাললেন।

সুজন ঘুরে দাঁড়াল।

আলোটা আবার নিবিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। দিয়ে এক ছুটে রাস্তার অন্য পাশে চলে গেলেন। "সুজন, আমি এখানে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর যেন সুজনের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। একবার কাছে যান, আবার দু-চার পা পিছিয়ে আসেন; কখনো রাস্তার ডান পাশে, কখনও বাঁ পাশে। আবার কখনো মাঝ-মধ্যিখানে। ঝপ করে টর্চটা জ্বালান, নিবিয়ে দেন। মাঝে-মাঝে মুখে আলো ফেলেন সুজনের। আলো চোখে পড়তেই সুজন দু হাতে চোখ আড়াল করে নেয়। চিৎকার করে জন্তুর মতন।

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু খেলাটা দেখছিল। অপলকে। সিদ্ধেশ্বর সুজনকে যেন ডাকছেন কাছে আসার জন্যে, তাঁকে ধরার জন্যে।

সুজন যেন কানামাছির খেলায় চোখ-বাঁধা চোরের মতন একবার এদিকে এগোচ্ছিল, আর-একবার অন্য দিকে। সিদ্ধেশ্বরকে সে আন্দাজ করতে পারছিল না। ক্রমশই খেপে যাচ্ছিল। দু হাত বাড়িয়ে এদিক-ওদিক এগোচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল—যেন একবার সিদ্ধেশ্বরকে ধরতে পারলেই সে এই খেলার পরিণামটা বুঝিয়ে দেবে সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরও সুজনকে ক্রমশ নিজের পছন্দ মতন জায়গায় টেনে নিচ্ছিলেন, ধোঁকা দিয়ে দিয়ে। মহাদেবের কাছ থেকে খানিকটা টেনেও নিলেন। দুজনেই এখন ফাঁকায়। বেশ কাছাকাছি।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বর আলো জেবলে আবার সুজনের চোখে ফেললেন। হাত তুলে চোখ আড়াল করল সুজন। রাগে চেঁচিয়ে উঠল। গালাগাল দিল

সিদ্ধেশ্বরকে। সিদ্ধেশ্বর আলো নেবালেন।

আলোটা নিবিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সুজন লাফ মারল।

সিদ্ধেশ্বর সরে যাবার জন্যে নিজেও লাফ মেরেছিলেন কিন্তু পারলেন না, পড়ে গেলেন। বোধ হয় হাতের টর্চ ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ছোরাটাও।

বরদার তাই মনে হল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর কোনো রকমে সরে গিয়েছিলেন, সরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেলেন।

সুজন এবার আর ভুল করল না।

সিদ্ধেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজন, পশু যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বরদার গলা দিয়ে আঁতকে ওঠার শব্দ হল। চোখ বুজে ফেলল সে। সিদ্ধেশ্বর যেচে সুজনের হাতে ধরা দিলেন। সুজন ওঁকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। কে যে যন্ত্রণায় ভীষণ চিৎকার করে উঠল তাও বুঝল না বরদা। তার সর্বাঙ্গ অসাড়। হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। কপালে তবু ঘাম জমছে। কোনো রকমে চোখ খুলল বরদা। দেখল, সিদ্ধেশ্বর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। কোনো রকমে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। একপাশে হেলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সুজন টলতে-টলতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল মাটিতে।

কী ঘটল বরদা বুঝল না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বেঁচে আছেন দেখে তার যেন নিশ্বাস পড়ল এতক্ষণে।

ডাক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। সতীশকে, বরদাকে।

সতীশ তার মোটর-বাইকের হেড লাইট জ্বালিয়ে চোখের পলকে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বরদা ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গেল।

মোটর-বাইকের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট করে। সুজনের গলার পাশ দিয়ে ছোরাটা চলে গেছে। মাটিতে পড়ে আছে সুজন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার গলা। রক্ত চুঁইয়ে কণ্ঠার কাছে নেমেছে, ঘাড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

সুজন মাটিতে পড়ে। শ্বাস টানার শেষ চেষ্টা করছে যেন।

মহাদেবকে আর দেখার কিছু ছিল না। মরে পড়ে আছে। অবিকল টাঙাঅলার মতন। তার মুখ ঘাড়ের দিকে ঘোরানো।

বরদা দু হাতে মুখ ঢাকল।

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "আমার বাঁ হাতটা ভেঙে গেছে, সতীশ। কাঁধের কাছ থেকে আর নাড়তে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বরের বাঁ হাতটা সত্যিই কেমন অদ্ভুতভাবে দুলছিল, যেন

হ্যাঙারে ঝোলানো জামার হাতা ঝুলছে।

সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরল সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বললেন, "ও যদি আমার গলাটা ধরত, আমার কী অবস্থা হত, বুঝতে পারছ? কপাল ভাল, আমার গলা ধরতে পারেনি, কাঁধের কাছটায় ধরে ফেলেছিল।" হাঁফাচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ বলল, "আপনি যে সুজনের কাছে যাবেন আমি বুঝতে পারিনি।"

"না গেলে কী হত সতীশ, ও বেঁচে থাকত, আরও কত নিরীহ মানুষকে মারত। ও সত্যিই পিশাচ। আমি যে কেন ওকে ভুল করে আমাদের কাছে এনেছিলাম কে জানে! ও আর মহাদেব মিলে আমাদের সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

সতীশ বরদাকে ডাকল। বলল, "আপনি ও-পাশটা ধরুন। সিধুদাকে গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাই আগে; তারপর দেখি কী করতে পারি।"

বরদা সতীশের কথামতন এগিয়ে এসে সিদ্ধেশ্বরকে ধরল। তাকাল একবার মহাদেবের দিকে। মরে পড়ে আছে রাস্তায়। হঠাৎ দেখলে, বরদা বলেই মনে হয়।

সুজনও মরছে। চোখের পাতা বুজে আসছে ওর; অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে। পিশাচের মৃত্যুর মতনই দেখাচ্ছিল।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বললেন, "আপনাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি এ আমার ভাগ্য। কিন্তু কালও আপনার কলকাতায় ফেরা হবে না। থানা পুলিসের একটা ব্যাপার রয়ে গেল। আপনাকে আরও দু-একদিন থাকতে হবে।"

বরদা বলল, "আপনি ভাববেন না। আমি থাকব।"

সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে বরদা আবার ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেল। সেই রকম ঝিমঝিমে জ্যোৎস্না, অসাড় গাছপালা। অথচ এমন নিস্তব্ধ, শান্ত, সুন্দর জায়গায় দুটো লোক মরে পড়ে থাকল। এই মাঠে।

বরদার দুঃখই হচ্ছিল।

—